নির্ঝর

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

শেফালি ৸০

ছোট গল্পের বই। বাঙ্গলা দেশের ঘরের কথা। গল্পগুলি শিশির-সিক্ত শেফালিরই মত কোমল সুন্দর।

পরদেশী ॥০

বিদেশী ওস্তাদদের বাছা বাছা ছোট গল্পের নিজের মতন করিয়া অনুবাদ।

দশচক্র ।৶০

নাটিকা। হাসির ফোয়ারার মধ্যে করুণ রসের ফল্গুধারা। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

যৎকিঞ্চিৎ ৷৷০

নাটিকা। রহস্যময়স্যালো। ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

নির্ঝর

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এল

মূল্য আট আনা।

সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী

সোদর-প্রতিমেষু

পূর্ব্বকথা

নির্ঝর প্রকাশিত হইল। ইহার সকল গল্পগুলিই পূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

দুই একটি গল্প বিদেশী গল্পের ক্ষীণ ছায়ামাত্র অবলম্বনে রচিত হইয়াছে, তবে সেগুলি অবশ্য আপনার ভাবেই গড়িয়া তুলিয়াছি। ইতি

ভবানীপুর,
ভাদ্র সংক্রান্তি, ১৩১৮।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সূচী

নির্ঝর

প্রতিঘাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে নলিনের বাল্যজীবনের ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করিতে হয়।

নলিন তখন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকগুলার সহিত তাহার পরিচয় কিরূপ ছিল, সে কথা খুলিয়া না বলিলেও চলে। তবে পাঠ্য ও অপাঠ্য বাঙলা কবিতাপুস্তক-গুলা তাহার হাতে পরিত্রাণ পাইত না। সেই সকল পুস্তক হইতে ভাবরস যেটুকু পাওয়া যাইত, তাহার সবটুকুই সে একেবারে মজ্জাগত করিয়া ফেলিত। ইহার ফলে, প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার সময়, গণিতে কোন মতে পাশ নম্বর পাইলেও, ক্লাশে সে সহপাঠিবর্গের মধ্যে কবি বলিয়া রীতিমত খ্যাতিলাভ করিল।

টিফিনের ছুটির সময় ক্লাশের অপর ছাত্রেরা যখন 'কুলের

আচার', 'চিনাবাদাম', 'লাটিম' প্রভৃতি লইয়া বিশ্বসংসার ভুলিবার উপক্রম করিত, নলিন তখন সেই সমস্ত কোলাহল হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়া গণিতের খাতা খুলিয়া অনির্দ্দিষ্টা নায়িকার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখিতে বসিত, "কোথা আছ, মনহরণি, কবে আসি মোর জীবনের কূলে, ভিড়িবে তোমার তরণী!" কখনও বা একধারে দাঁড়াইয়া গুন্ গুন্ স্বরে সে আপনার মনে গান গাহিত, "দিবস-রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।"

এতটা কবিত্ব ও প্রেমের স্বপ্নবিহ্বলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী যখন তাহাকে প্রবেশদ্বারে ছাড়পত্র দিতে অসম্মত হইলেন, তখন তাহার অভিভাবকগণের রুদ্র শাসন তাহার বিরুদ্ধে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া উঠিল। বাড়ীতে রীতিমত পাহারা বসিল। নূতন মাষ্টার মহাশয়টি অতিরিক্ত পঠনোৎসাহে তাহার কবিত্বকুঞ্জে দুরন্ত পবনস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহারই চেষ্টায়, দুই বৎসরকাল সকল সাধ-আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, প্রবেশিকার অর্গল খুলিয়া নলিন এবার কলেজ-জীবনে অধিকার পাইল।

বয়সের সঙ্গে কাব্যচর্চ্চাটা না-কমিয়া ভিতরে ভিতরে বাড়িয়াই উঠিতেছিল, অভিভাবকগণের পক্ষে সে সংবাদটুকু রাখিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। মস্তকে দীর্ঘ কেশ কুঞ্চিত করিয়া রাখিয়া, পৌষের দারুণ শীতেও সূক্ষ্ম পঞ্জাবীমাত্র গায় দিয়া, বুটের পরিবর্ত্তে লপেটা ব্যবহার করিয়া এবং গোপনে

"সুধাংশু-দীপিকা" পত্রিকার সম্পাদকী করিয়া, অর্থাৎ এমনই নানাবিধ প্রচলিত উপায়ে, বন্ধুবর্গের মধ্যে সে আপনার কবি খ্যাতিটুকু সমধিক প্রসারিত করিয়া ফেলিল।

এ কয় বৎসরে তাহার চিত্তে আর একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। "সুধাংশু-দীপিকা" পত্রিকায় 'লিরিক' প্রকাশ করিয়া, প্রায়ই সে আকুলা নায়িকার সুরঞ্জিত পত্রের প্রতীক্ষা করিত। এবং যে দিন পত্রিকা-পৃষ্ঠায় তাহার ফটো প্রকাশিত হয়, সেই দিন হইতে, পথে চলিবার সময়, তাহার মনে হইত, বুঝি কোন বাতায়ন হইতে কোন লজ্জাশীলা নায়িকার করচ্যুত পুষ্পমাল্য তাহার কবিকণ্ঠ ভূষিত করে। কিন্তু বাঙলা দেশের কাব্য-রসানভিজ্ঞা সঙ্কুচিতা নায়িকাগণ একদিনও তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহে নাই, ইহা দেশের পক্ষেও অল্প দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে।

এই সময় আবার তাহার অকবি বন্ধুগণের একে একে বিবাহ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহার হইল না। কারণ, নলিনের নিষ্ঠুর পিতা সুদৃঢ় পণ করিয়াছিলেন যে এফ এ, পাশের পূর্ব্বে কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিবেন না। নলিনের মাতার অভিমান ও অশ্রুসিক্ত কাতর অনুরোধ, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্য, বন্ধুবর্গের লোভপ্রদর্শন—কোনটিই নলিনের হৃদয়হীন পিতাকে টলাইতে পারে নাই। অবশেষে তিন চারিবার ফেল হইয়া, নলিন যখন রীতিমত প্রমাণ করিল যে, সে এফ-এ, পাশ করিবে না, তখন একদিন আলো, বাজনা ও পুষ্পসুরভির সমারোহের মধ্যে সে বিবাহ করিয়া

নববধূ গৃহে আনিল। এবং ইহার ঠিক এক বৎসর তিন মাস সতের দিন পরে নলিনের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া নলিনকে কাব্যচর্চ্চায় অখণ্ড অবসর দান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীকে লইয়া নলিন একটু বিপদে পড়িয়াছিল। মানসরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্যস্বরূপ প্রণয়-গদ্‌গদ ভাষা লইয়া সে যখন প্রভাকে সম্ভাষণ করিত, তখন প্রভা এমন সহজ সরল হাস্যের ফুৎকারে সেগুলি উড়াইয়া দিত যে, নলিনের পক্ষে গাম্ভীর্য্য ও ক্রোধ কোনটাই সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। এক একবার তাহার মনে হইত, স্ত্রী ও সংসার সব ফেলিয়া কোথাও চলিয়া যায়। কাহাকেও কোন সংবাদ দিবে না, গৈরিকবসন পরিয়া দেশ পর্য্যটন করিবে, মস্তকে বিপুল জটাভার ধারণ করিবে। অবশেষে কোন এক দুর্দ্দিনে ফিরিয়া সুমধুর সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে প্রভার ভগ্ন হৃদয় স্পর্শ করিবে! প্রভা তখন তাহার পায় ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে—তবু সে আপনার সঙ্কল্প অটল রাখিবে। এমনই একটা উদ্ভট উপায়ে সে প্রভার নিষ্ঠুরতা ও তাচ্ছল্যের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু উপায় অবলম্বনেও অনেকখানি বিঘ্ন ছিল। প্রভার সুন্দর মুখখানিতে এমন একটা মোহ ছিল, যাহা নলিনকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল। প্রভাকে ছাড়িয়া নলিন কোথাও থাকিতে পারিত না। সুতরাং ইচ্ছা-সত্ত্বেও

বেচারা নিতান্ত নিরুপায় চিত্তে আপনার হৃদয়ের উপর এই সকল ক্রুর অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত।

* * * * *

সেদিন বন্ধুগৃহে সান্ধ্যভোজে গানের মজলিস বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। ললিতকণ্ঠে মধুর সঙ্গীতালাপ, আতর গোলাপের স্নিগ্ধ সুরভি সমস্ত মিলিয়া নলিনের মনে একটা মাদকতার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল। বিবিধ প্রণয় সঙ্গীতে তাহার কবিহৃদয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সে আজ গৃহে ফিরিয়াই প্রিয়ার ভুজবন্ধনে ধরা দিবার আশায় একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল।

বসন্তের স্নিগ্ধ 'দখিণা' বহিতেছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। নলিনের গৃহের সম্মুখে বারাণ্ডায়, টবে একরাশ বেলফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। পথে আসিবার সময়, সে দুইটা ছোট ফুলের তোড়াও সংগ্রহ করিতে ভুলে নাই। নলিন কক্ষে আসিতেই প্রভা আসিয়া কহিল, "জ্যেঠাইমার বড় অসুখ করেছে।"

কথাটা কাণে না তুলিয়া নলিন প্রভাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "প্রভা!"

"আঃ, ছাড়—কি কর! জ্যেঠাইমার অসুখ। আমি তাঁর কাছে রাত্রে থাক্‌ব, তাই বল্‌তে এলুম। তুমি শুয়ে পড়, আমি মশারিটা ফেলে দিয়ে যাই।"

প্রভাকে বুকে টানিয়া, তাহার মুখে চুম্বন করিয়া নলিন

কহিল, "হোক্‌গে অসুখ! এমন জ্যোৎস্নারাত্রি রোগীর সেবার জন্য নয়, প্রভা! এস, এই জ্যোৎস্নায় খানিক বসি, দুজনে! তুমি ঐ বকুল ফুলগুলো নিয়ে একটা মালা গাঁথ, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকি। কি সুন্দর আজ দেখাচ্ছে তোমাকে, প্রভা!"

স্বামীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া প্রভা কহিল, "না, ছিঃ, আমি জ্যেঠাইমার কাছে না থাক্‌লে চল্‌বে না। তুমিও একবার তাঁকে দেখ্‌বে চল! এস, লক্ষ্মীটি!"

নলিন বিরক্ত চিত্তে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "প্রভা!"

প্রভা কহিল, "কি?"

নলিন কহিল, "তুমি এখন যেতে পাবে না। এস, এই ফুলটি তোমার খোঁপায় পরিয়ে দি। সে গানটা মনে আছে,—

"অলকে কুসুম না দিয়ো,
শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজল-বিহীন সজল নয়নে হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো।"

প্রভা একদৃষ্টে স্বামীর প্রতি চাহিয়াছিল। এমন সময় ঝি ডাকিল, "বৌদিদি!"

"ছাড়, আমি যাই", বলিয়া প্রভা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তাড়াতাড়িতে নলিনের সযত্ন-দত্ত প্রণয়োপহার ফুলটি তাহার কবরীচ্যুত হইয়া ধূলায় লুটাইল।

নলিন কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার চক্ষে জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিল। সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বারাণ্ডায়

আসিয়া দাঁড়াইল। রাগে, অভিমানে, তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল। সে একবার ভাবিল, ঐ বড় ফুলের টবটা তুলিয়া আপনার মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করে। রক্তস্রোতে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। প্রভা আসিয়া দেখুক, তাহার উপেক্ষিত হৃদয়বান স্বামীর অন্তিমকাল উপস্থিত। আবার মনে হইল, বারাণ্ডা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া, এখনই আত্মহত্যা-দ্বারা প্রভার এই নিষ্ঠুর উপেক্ষার চূড়ান্ত প্রতিশোধ লয়। সমস্ত প্রকৃতিটা তাহার নিকট আগুনের মত তপ্ত বোধ হইতেছিল। সে শুধু ভাবিতেছিল, কি করিয়া প্রতিশোধ লওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই স্থানেই সে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, প্রভা নিশ্চয় আসিবে। সে কি এতটা তাচ্ছল্য করিতে পারে? নলিনের হৃদয়ের বেদনাটা কি সে একটুও বুঝিবে না? সত্যই কি এমন অরসিকার হস্তে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে?

কিন্তু হায়, সব বৃথা হইল! প্রভা ফিরিল না। নলিনের মাথাটা দপ্-দপ্ করিতেছিল। সে বারাণ্ডায় মেঝেতেই শুইয়া পড়িল।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রতিশোধ-গ্রহণের একটা উপায় সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ভাবিল, তাহার প্রেম একনিষ্ঠ, প্রভাকে সে এতটা ভালবাসে, এই জন্যই প্রভা তাহাকে অবজ্ঞা করে! এবার হইতে সে-ও প্রভার প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিবে। সে কোন নায়িকার উদ্দেশ্যে বাহির হইবে, এবং প্রভা যখন তাহারই প্রতীক্ষায় বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া

বিনিদ্র বিভাবরী যাপন করিয়াও তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না, তখনই এই সকল অবজ্ঞা ও অপমানের কড়ায়-গণ্ডায় প্রতিশোধ হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে রাগটা একটু নরম পড়িলে, নলিন পা টিপিয়া জ্যেঠাইমার কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখে, কক্ষমধ্যে জ্যেঠাইমা নিদ্রিতা এবং তাঁহারই বুকের কাছে প্রভা জড়সড় ভাবে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! রাগে তাহার শরীর আবার জ্বলিয়া উঠিল। বটে! এইরূপে প্রভা রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে! কেন, জ্যেঠাইমা যখন নিদ্রিতা হইলেন, তখন আর কাহাকেও তাঁহার নিকট রাখিয়া, কি সে স্বামীর নিকট আসিতে পারিত না। কেবল বাহাদুরি লইবার জন্যই প্রভার এতটা আগ্রহ। নলিনের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্য নাই? হায়!

প্রভার হাতটা ধরিয়া প্রবলভাবে নাড়িয়া, নলিন তীব্রস্বরে কহিল, "এই বুঝি সেবা হচ্চে! বেশ!" কথাটার সহিত হৃদয়ের সমস্ত বিষ ঢালিয়া দিয়া প্রভার উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া নলিন একেবারে নীচে নামিয়া আসিল। সেখানে ইজিচেয়ারে পড়িয়া, কপালে হাত দিয়া, চক্ষু দুইটা মুদ্রিত করিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় বন্ধু অক্ষয় আসিয়া কহিল, "অজয়ের বিয়ের ত সব কাল ঠিক হয়ে গেল হে।" অজয় অক্ষয়ের ভ্রাতা।

নলিন চক্ষু খুলিতেই অক্ষয় কহিল, "কিহে, চোখদুটো যে লাল হয়ে রয়েছে। ঘুমোওনি কাল রাত্রে?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নলিন কহিল, "আমার মত লক্ষীছাড়ার আবার ঘুম।"

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "ইস্, মাথাশুদ্ধ খারাপ দেখছি যে! চা-টা ফরমাস কর! সব সাফ্ হয়ে যাবে।"

"নাঃ, চা খাব না।"

অক্ষয় কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তাইত, ব্যাপার কি? প্রভার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, বুঝি।"

নলিন গতরাত্রের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া কহিল, "আর পারি না, আমি! এবার তাকে রীতিমত শিক্ষা দোব।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অক্ষয় কহিল, "অর্থাৎ?"

নলিন কহিল, "তাকে বোঝাব, আমিও তাকে অবহেলা করতে জানি। সে আমাকে ভালো না বাসলে, আমারও তাতে কিছু আসে-যায় না।"

অক্ষয় কহিল, "এঃ, তুমি একবারে আস্ত একটি নায়ক হয়ে উঠলে! মাথা ঠাণ্ডা কর হে, মাথা ঠাণ্ডা কর।"

নলিন কহিল, "মাথা বেশ ঠাণ্ডা আছে! আমি কি করব, তা তোমাকে বরং বলে রাখি। বাঁ হাতে একখানা প্রেমপত্র আমি লিখবো—যেন কোন স্ত্রীলোক আমাকে লিখছে। তারপর সেই চিঠিখানা যাতে প্রভার হাতে কোনমতে পড়ে, তার বন্দোবস্ত করব। সে পড়ে জ্বলতে থাকবে, আর নিশ্চয় আমার

পায় লুটিয়ে পড়বে, তখন একবার আমিও তাকে দেখে নোব।”

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, “মতলবটা মন্দ নয়! বেশ একখানা কমেডি লিখে ফেলা যায়। আঃ, একটুও যদি লেখবার ক্ষমতা থাকত। মোদ্দা, অমন কাজটি করোনা, দাদা! আমাদের বাঙালীর মেয়েগুলো, ঠাট্টাই বল, আর গাঁট্টাই বল, সব বেমালুম হজম করতে পারে, কেবল এইটি ছাড়া। এইটিতে তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাওয়া ভারি স্বাভাবিক। এটা তাদের মর্ম্মান্তিক লাগে।”

অক্ষয় অনেক বুঝাইল। কিন্তু ভীষ্মের ন্যায় নলিনের সঙ্কল্প আজ অটল, স্থির।

সেদিন রাত্রে অক্ষয় যখন আপনার পত্নীর কাছে নলিনের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিল, তখন সরযূ কহিল, “কি বুদ্ধি! আর তোমরা পুরুষজাতটা এমনই! আমরা তোমাদের একটা আদরের কথার জন্য প্রাণ দিতে পারি, আর তোমরা আমাদের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর কৌতুক কর।”

সরযূর নাসিকাটি ঈষৎ নাড়িয়া অক্ষয় কহিল, “ও কথা বলোনা, সরু! সবাই কি অমন! নলিনটা বদ্ধ পাগল। পাগলের কথা কি ধরতে আছে?”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অজয়ের বিবাহের গোল চুকিলে সরযূ একদিন স্বামীকে কহিল, “কিগো, নলিনবাবুর সে চিঠির খবর কি?”

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "তুমিও যেমন। সে ঐ মুখের কথা শুধু। নলিন ভুলে বসে আছে, আর কি।"

সরযূ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি মনে পাড়িয়ে দিয়োনা, একবার। মজাটা দেখা যায়, বেশ!"

অক্ষয় কহিল, "বটে, তুমি মজা দেখ! কারো পোষ মাস, কারো সর্ব্বনাশ।"

*　　*　　*　　*　　*

মধ্যাহ্নে লাইব্রেরী হইতে আনীত উপন্যাসখানি খুলিবামাত্র তাহার মধ্য হইতে প্রভা নারী-হস্তলিখিত এক পত্র পাইল। পত্রখানি এইরূপ—

প্রিয়তমেষু,

নলিনবাবু, সেদিন আসিব বলিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আসিলেন না। এ তিনদিন আপনার অদর্শনে আমি চাতকিনীর মত পথ চাহিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু রোজই নিরাশ হইতেছি। অত ভালবাসা, অত সোহাগ আদর, সে কি শুধু ছলনা? না, নলিনবাবু, আপনি জানেন না—আপনাকে না দেখিতে পাইলে আমার মন কত অশান্ত হয়। আপনি যদি তাহা বুঝিতেন। আমার যদি পাখীর মত ডানা থাকিত ত উড়িয়া গিয়া দেখিয়া আসিতাম। প্রভা দেবী বুঝি পথ আগুলিয়া রাখিয়াছেন।

আপনাকে আসিতেই হইবে, আজ—নিশ্চয়। নহিলে আজ রাত্রে বিষের জ্বালায় হৃদয়ের জ্বালার নিবৃত্তি করিব। তখন

দোষ দিতে পারিবেন না যে, আপনার শৈ আপনাকে না বলিয়া মরিয়াছে।

আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে! আজ আসিবেন,—নহিলে এই শেষ।

কি করিব, নলিনবাবু, আপনাকে দেখিলে যে আবার মরিতেও ইচ্ছা হয় না, নহিলে এ কয়দিন কি না মরিয়া থাকি?

আপনারই
পদাশ্রিতা দাসী শৈ—

পত্রখানি, প্রভা একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিল। সহসা বাহিরে নলিনের পদশব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি সে চিঠিখানা পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া দিল।

নলিন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই জামার পকেট, বালিস প্রভৃতি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল,—যেন কি-একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অনুসন্ধান করিতেছে।

প্রভা থাকিতে পারিল না, কহিল, "কি খুঁজছ?"

মুখটা যথাসম্ভব বিবর্ণ করিয়া নলিন কহিল, "কিছু না—এই —এই—"

প্রভা কাছে আসিয়া কহিল, "কি বল না! বলবে না?"

"এ-একটা চিঠি!"

"খুব দরকারী চিঠি নাকি?"

"অ্যাঁ—হ্যাঁ দরকারী বৈ কি।"

"এটা নয় ত ?" বলিয়া পুস্তকের মধ্য হইতে 'শৈ'-স্বাক্ষরিত পত্রখানা প্রভা বাহির করিয়া দিল। নলিন ক্ষিপ্র হস্তে পত্রখানা লইয়া কহিল, "এইটেই বটে ! তুমি দেখনি ত ?"

প্রভা উত্তর না দিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল ! "প্রভা," বলিয়া নলিন তাহার হাত ধরিল।

"যাও—আমি সব জানি ! ছাড়," বলিয়া প্রভা দ্রুতপদে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

নলিনের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। সে ভাবিল, এবার খুব শাস্তি দিয়াছে, সে ! জয়ের আনন্দে একেবারে সে নীচে নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কবিতার প্রুফ সংশোধন করিবে বলিয়া নলিন সবে-মাত্র তাড়াটি খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় চাঁপা ঝি শশব্যস্তে আসিয়া কহিল, "দাদাবাবু গো, সর্ব্বনাশ হয়েছে !"

নলিনের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল ! সে কহিল, "কেন রে, কি হয়েছে ?"

"বৌদিদি কেমন করছে ! শীগগির এস গো, দাদাবাবু" বলিয়াই চাঁপা ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরাভিমুখে ছুটিল।

ত্রস্ত চরণে ছুটিয়া আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া নলিন দেখে, প্রভা শুইয়া রহিয়াছে, মাথার চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে, চক্ষুদুইটি মুদ্রিত, মুখ বিবর্ণ।

কম্পিতকণ্ঠে নলিন ডাকিল, "প্রভা!"

প্রভা চোখ চাহিতে চেষ্টা করিল। নলিন তাড়াতাড়ি পাশে বসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, "প্রভা, এমন কচ্ছ কেন?"

চাঁপা রুদ্ধস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল, "বৌদিদি বিষ খেয়েছে! কি হবে, দাদাবাবু?"

নলিন চমকিয়া উঠিল। "এ্যাঁ, সে কি!" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে দোয়াত কলম লইয়া বন্ধু পরেশ ডাক্তারকে পত্র লিখিল, "এখনই এস। বিশেষ বিপদ।"

বাহিরে আসিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, "শীঘ্র পরেশবাবুর বাড়ী যা—এখইন তাঁকে নিয়ে আস্‌বি—ছুটে যা,—গাড়ী ভাড়া করে যা—"

ভৃত্য পত্র লইয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

ফিরিয়া আসিয়া প্রভার মস্তক আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া নলিন ডাকিল, "প্রভা!" প্রভার মুখ তখন আরও বিবর্ণ হইয়া আসিতেছিল।

অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে মৃদুকণ্ঠে প্রভা কহিল, "ডাকছ? কেন?"

নলিন কহিল, "এ কি করেছ, প্রভা? একেবারে এমন শাস্তি দিতে হয়?"

প্রভা কহিল, "বেঁচে কি সুখ! আমি সব জানি!"

রুদ্ধ কম্পিতস্বরে নলিন কহিল, "কি জান, প্রভা?" নলিনের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া প্রভার গণ্ডের উপর পড়িল।

প্রভা কহিল, "না, কেঁদোনা! আমি তোমাকে একটুও সুখী করতে পারিনি, ক্ষমা কর!"

নলিন প্রভার অধরে চুম্বন করিয়া কহিল, "তোমাকে পেয়ে যে আমি স্বর্গ পেয়েছি, প্রভা! তোমায় কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না?"

প্রভা কহিল, "যাকে পেয়ে সুখী হয়েছ"—

নলিন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ক্ষমা কর, প্রভা, ক্ষমা কর আমাকে! সে সব মিথ্যা! সে চিঠি আমি নিজে বাঁ-হাতে লিখেছিলুম, শুধু একটু তামাসা করবার জন্য। অক্ষয় জানে— উঃ, আমি কি করেছি!"

প্রভা কহিল, "না, ছিঃ, কেঁদোনা—ভাবনা কি? এক প্রভা গেলে লক্ষ প্রভা হবে।"

নলিন কহিল, "না, না, আমার প্রভার তুলনা নেই!"

প্রভা কহিল, "যদি বাঁচি ত আর কখনও অনাদর করবে না?"

নলিন কহিল, "এ যাত্রা যদি ফিরে পাই তোমাকে,—তা হলে তোমায় মাথায় করে রাখবো, প্রভা!"

প্রভা, কহিল, "না, ছিঃ, ও কথা বলতে নেই! তবে আমি বাঁচলে যদি তুমি সুখী হও ত, আবার আমার বাঁচতে ইচ্ছা করে!"

কথাটা বলিয়া প্রভা উঠিয়া বসিল। নলিন কহিল, "ও কি? না, না, শোও শোও! কষ্ট হবে যে, তোমার!"

প্রভা কহিল, "কিসের কষ্ট? তুমি ঠিক বলছ, চিঠিখানা মিথ্যা?"

নলিন কহিল, "আগাগোড়া মিথ্যা! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি!"

প্রভা স্বামীর পায় মাথা রাখিয়া কহিল, "ক্ষমা কর, আমাকে! তোমাকে অনর্থক কষ্ট দিলুম! আমার এ বিষ-খাওয়াও মিথ্যা!"

নলিন কহিল, "সে কি?"

"হ্যাঁ। অক্ষয়বাবুদের বাড়ী বিয়েতে সেদিন যখন নিমন্ত্রণে যাই, সরযূ তখন আমাকে সব কথা বলে! তাই আমিও একটু রঙ্গ করলুম! আর তোমার এমনধারা কাব্য ভালও ত লাগে! চাঁপা এর কতক-কতক জানে! আমি বিষ খাইনি, এবং কখনও খাবনা—এ তুমি ঠিক জেনো!"

নলিন কহিল, "আঃ, তাই বল! আমার এমন ভয় হয়েছিল!"

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "ডাক্তারবাবু এসেছেন!"

নলিন কহিল, "দেখ দেখি, এখন উপায়! ছি, ছি, রীতিমত কেলেঙ্কারি! কি মনে করবে?"

প্রভা কহিল, "আঃ, কিছু ভাবনা নেই! বলগে, একটু রঙ্গ করে, ডাকা গেছে। অনেক দিন আসনি, তাই! তার পর সন্ধ্যাবেলা খাবার নিমন্ত্রণ কর, কোন-গোল হবে না।"

দুর্লঙ্ঘ্য।

দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছিল। দুইজনে নদীর তীরে বসিয়াছিল। মাথার উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল বাসায় ফিরিতেছিল।

রজ্জব কহিল, "এত বিষয়-সম্পত্তি—তুমি বিবাহ না করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে!"

মীর আলি কহিল, "বিশেষ অসুবিধা ত দেখছি না!"

রজ্জব কহিল, "অথচ নারীজাতির উপর তোমার এত সম্ভ্রম! আশ্চর্য্য!"

মীর আলি কহিল, "আশ্চর্য্য নয়, মোটে! নারী পূজার যোগ্য! তুমি কি কথাটা স্বীকার কর না?"

রজ্জব কহিল, "অস্বীকার করি না—তবে দোষে-গুণে পুরুষ যেমন, নারীও তেমন—কবিদের মত বাড়াবাড়ি করা আমার স্বভাব নয়। মোদ্দা সে কথা যাক্—সদত আলি তার মেয়ে সোফির জন্য অত পীড়াপীড়ি করেছিল—আমরা ভেবেছিলাম,—"

বাধা দিয়া মীর আলি কহিল, "রজ্জব, লোকে ভালবাসে একবার এবং একজনকে মাত্র! দু'বার ভালবাসা যায় না!"

রজ্জব কহিল, "সে কি! তুমি আবার কবে কাকে ভালবাসলে!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মীর আলি কহিল, "বেসেছিলাম, রজ্জব!"

রজ্জব চমকিয়া উঠিল। একটু আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "বলতে কোন আপত্তি আছে, কি?"

ছোট ঢেউগুলি নদীর তটে আসিয়া লাগিতেছিল। মীর আলি জলের দিকে চাহিয়াছিল;

মীর আলি কহিল, "না, আপত্তি আর কি!"

সন্ধ্যার আঁধার নিবিড়তর হইতেছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না। বাতাসটুকু আরও শান্ত শীতল হইয়া আসিল। মীর আলি কহিল, "সে যেন স্বপ্ন! তখন আফগান যুদ্ধ বাধিয়াছে। আফগান বালিকা মরিয়মকে প্রথম দেখি, এক ঝরণার ধারে। শ্রান্ত হইয়াছিলাম। ঘোড়াটাকে নিকটে এক খেজুর গাছে বাঁধিয়া পাহাড়ের পাথরে ঠেস দিয়া আমি বসিয়াছিলাম। রোদ পড়িয়া আসিতেছিল। দুই একটা পাখী ডাকিতেছিল—তাহাই শুনিতেছিলাম। মন হইতে সকল দুর্ভাবনা, সকল বাসনা দূর করিয়া দিয়াছিলাম। অশ্বের হ্রেষা নাই, নররক্তলোলুপ সৈনিকের হুঙ্কার নাই! রণবাদ্যের সে উন্মাদ ঝন্‌ঝনা নাই! যুদ্ধ সেদিন বন্ধ ছিল। চারিধারে অপূর্ব্ব শান্তি! আমি ভাবিতেছিলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতার কথা! এই শান্তি-সুখ, নষ্ট করিতে তার কি পৈশাচিক আগ্রহ!

এমন সময় মরিয়মকে দেখিলাম। সে জল লইতে আসিয়াছিল। সহসা তাহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন আকাশ হইতে হুরী নামিয়া আসিয়াছে! এমন রূপ!

আমাকে দেখিয়া সে যেন শিহরিয়া উঠিল। বন্দুকটা আমার পাশেই পড়িয়াছিল। সে চলিয়া যাইতেছিল। আমি আশ্বাস দিলাম! সে কহিল, না জানিয়া সে আসিয়াছে। নিকটেই তাহার কুটির। বৃদ্ধা বিধবা পিতামহীর জন্য সে ঝরণা হইতে জল লইতে আসে। একটি ভাই আছে,—সে আফগান সৈন্যবিভাগে কাজ করে! প্রত্যহই এমন সময়, সে এখানে আসে। এধারে কোন সৈনিক যাতায়াত করে না। বনের প্রান্ত,—পথও নাই,—তাই কোন পথিকেরও এদিকে আসিবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না।

তারপর হইতে প্রতিদিন কি এক বিচিত্র আকর্ষণে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে, সকলের অলক্ষ্যে সেই ঝরণার ধারে আমি আসিয়া বসিতাম! চারি ধার পাখীর গানে ভরিয়া উঠিত! ঝরণার জল শতধারে ঝরিয়া পড়িত! এই নিভৃত নির্জ্জনে, আফগান-কন্যা মরিয়মকে নিতান্ত আপনার জন করিয়া তুলিলাম! এক একবার মনে হইত, এই দানবী হিংসা-দ্বেষ ছাড়িয়া, মরিয়মকে লইয়া, দূর বনের কোলে কোথাও চলিয়া যাই!

মরিয়মকে একদিন কথাটা বলিলাম।

সে কহিল, যতদিন তাহার পিতামহী বাঁচিয়া আছে, ততদিন সে নিজের সুখের কথা ভাবিবে না! আমার সঙ্গে যে তাহার দেখা হইত, সে কথা পিতামহী জানিত না।

মরিয়ম আমার জন্য আঙুর, আপেল, বেদানা প্রভৃতি লইয়া আসিত, আমিও নানা রঙের গন্ধের পাহাড়ী ফুলে-লতায় তাহাকে সাজাইয়া দিতাম !

তারপর যুদ্ধের কোলাহল তীব্রতর হইয়া উঠিল। প্রায় এক মাস আর আমাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সন্ধ্যার সময়, আমার প্রাণ,—কি যে চঞ্চল হইয়া উঠিত, কিন্তু উপায় ছিল না।

সেদিন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। চারিজন সৈনিক এক তরুণ আফগান বালককে লইয়া আসিল! দিব্য কোমল সুন্দর মুখশ্রী। বালকটি চর,—গুপ্তভাবে সন্ধান লইতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে।

চাহিয়া দেখিতেই মরিয়মের মুখ মনে পড়িল! যেন তাহারই ছায়া। ভাবিলাম, একি তাহার ভাই ? নিশ্চয়! এ মুখ আর কাহারও নয়! কিন্তু কর্ত্তব্যের সম্মুখে সম্পর্ক কত তুচ্ছ! অবিচলিত কণ্ঠে তখনই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম! আমারই উপর বিচার ভার ছিল।

সৈন্যেরা তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল।

আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই নিভৃত ঝরণার ধারে যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। কতদিন আমার মরিয়মকে দেখি নাই! কিন্তু তখন চারিধারে ফৌজের ছাউনী পড়িয়াছে —যাওয়া সহজ ছিল না।

একজন সৈন্য আসিয়া বলিল, বন্দী আমার সহিত একবার

সাক্ষাৎ করিতে চাহে। আমি আসিতে বলিলাম। নির্জ্জন কক্ষে বন্দী ও আমি—আর কেহ ছিল না। আমি কহিলাম, "কি চাও, তুমি ?"

সেলাম করিয়া সে বলিল, "মরিয়মকে জানেন! আমি তার ভাই।"

অবিচলিতকণ্ঠে আমি কহিলাম, "তার খবর, তুমি কিছু জান ?"

সে কহিল, "একখানা চিঠি আছে, আপনার জন্য! মরিয়ম দিয়াছে। কিন্তু এখন মিলিবে না! কোমরবন্ধে আছে; আমার মৃত্যুর পর লইয়া পড়িবেন—অনুরোধ।"

তারপর প্রহরী আসিয়া আমার ইঙ্গিতে তাহাকে লইয়া গেল। আমিও তাঁবুর বাহিরে আসিয়া বসিলাম। আকাশে তখন মেঘ জমিতেছিল।

একটু পরে বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চোখ বুজিলাম। চকিতে আবার মরিয়মের মুখ মনে পড়িল। কি করিব ? কর্ত্তব্যের কাছে যে আমি বন্দী।

মৃতদেহের নিকট গেলাম। কোমরবন্ধ হইতে পত্র বাহির করিয়া, বালকের কবরের আদেশ দিয়া তাঁবুতে ফিরিলাম।

তখন কড়্কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। তাঁবুর ভিতর আলো জ্বালাইয়া পত্র খুলিলাম। মরিয়ম নিজের হাতে অক্ষরগুলি সাজাইয়া পত্র লিখিয়াছে ;—এইরূপ

প্রাণের আলি,

প্রিয়তম, খোদার কাছে তুমিই আমার স্বামী। তুমি জান, আমার ভাই মহম্মদ ফৌজে চরের কাজ করিত। যুদ্ধের সময়, কাজের সময়, সে শিবির ছাড়িয়া আমাদের কাছে আসে। মরণকে তার বড় ভয়—পৃথিবী ছাড়িতে তার ইচ্ছা নাই—তাই সে পলাইয়া আসিয়াছিল।

তুমি জান, এ দোষের ক্ষমা নাই। আমরা গরিব, কিন্তু আমার পিতা পিতামহ আমিরের কাজে, হাসিমুখে, যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে—কুলাঙ্গার মহম্মদের জন্য সে গৌরব ধূলায় মিশিবে—আমার সহ্য হইল না! তাই তার বেশ ধরিয়া আমি তার কাজে আসিয়া যোগ দিলাম। কেহ চিনিতেও পারিল না।

পিতামহীকে লইয়া মহম্মদ দেশ ছাড়িল। কোন দিন যদি সে হতভাগার দেখা পাও ত, ছাড়িয়া দিও—এমন হীন প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে যদি তার সাধ হয়, তবে বাঁচিতে দিও, মারিও না—তোমার কাছে এইটুকু শুধু আমার মিনতি।

চর-বেশে তোমাদের দলের সন্ধানে আসিয়া ধরা পড়ি—তারপর কি হইল, সবই জান—

এখন বিদায়, আলি—তোমাকে কত ভালবাসিতাম, তাহা বুঝাইতে পারিলাম না, এই দুঃখ রহিয়া গেল! তবু তোমারই দেওয়া মৃত্যুদণ্ড লইয়া হাসিতে হাসিতে মরিলাম, সে কি কম সুখ!

এবার এই পর্য্যন্ত। যদি বেহেস্ত্ থাকে, তবে সেখানে আবার দুইজনের দেখা হইবে। আজ আসি, আলি, বিদায় দাও।

মরিয়ম।

ভূত দেখা।

১

ভূত আছে কি না, তাহা লইয়াই তর্ক চলিতেছিল।

তর্কের মাত্রা অতিরিক্ত চড়িয়াছিল। উমেশ ভায়া প্রাণপণ বলে বলিয়া উঠিল, "চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস না করলে ত, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না!"

যতীশ কহিল, "আমি নিজে না দেখে থাকি, অপরে ত তাঁকে দেখেছে, তারপর টাকা ও টিকিটের উপর মুখের ছবি, ফটোগ্রাফ—এ সবেও ত তাঁর অস্তিত্ব দস্তুরমত প্রমাণ হচ্ছে!"

উমেশ উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "পথে এস, দাদা—তেমন ভূতও অনেকে দেখেছে—এবং এখানে না হলেও, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তার ফটো পাওয়া যাচ্ছে!"

সত্য! কথাটা উড়াইবার উপায় ছিল না। যতীশ-কোম্পানি নিজেদের ফাঁদে আপনা হইতেই ধরা দিল। শ্যাম এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তর্ক থামিতে সে কহিল, "আমি একটা চাক্ষুষ প্রমাণের কথা জানি।"

সকলে সাগ্রহে কহিল, "কি রকম ?"

"ও সব নিয়ে বাজে তর্ক করলে চলবে, কেন ?" বলিয়া সূক্ষ্ম শরীর, অ্যাষ্ট্রাল প্লেন প্রভৃতি, কতকগুলা দুর্ব্বোধ্য প্রকাণ্ড কথা, উমেশ এক নিশ্বাসে বলিয়া গেল।

আমরা শ্যামকে চাপিয়া ধরিলাম, "কি রকম প্রমাণটা হে ?"

শ্যাম কহিল, "তবে শোন !"

২

শ্যাম আরম্ভ করিল, "সে আজ প্রায় আঠোরো বৎসরের কথা ! তখন প্রেসিডেন্সিতে বি, এ পড়ি। মাঘ মাস। মন্মথর বিবাহের ধুমে হোষ্টেলে কাহারও কাজকর্ম্ম ছিল না। বর্দ্ধমানে বিবাহ হইবে—ট্রেণের সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সহর বর্দ্ধমান কখনও দেখি নাই, দেখিব ; তাহার উপর, হাবড়া হইতে বর্দ্ধমান অবধি সেকেণ্ড ক্লাসে লগেজ-নারী বিবর্জ্জিত অবস্থায় ভ্রমণ,—বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া হাসি গল্প-গানে সারাপথ নিশ্চিন্ত আরামে কাটাইয়া দিব—ইহারই আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলাম।

বিবাহের দিন, সজ্জিত বেশে সকলে বাহির হইলাম। মন্মথ যাইয়া বরবেশে ফার্ষ্ট ক্লাশে উঠিল—আমরা, বরযাত্রীর দল, সেকেণ্ড ক্লাসের রিজার্ভ কক্ষ অধিকার করিলাম। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল—একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "ধন্য রাজা পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" কথাটা আমাদের মোটেই ভাল

লাগে নাই। কারণ, শাল দোশালা পাম্প-সু ভিজিইয়া মাটি হইয়া যাইলে, 'রাজার পুণ্য দেশের জয়' গাহিবার প্রবৃত্তি হইবে না। ট্রেণ শ্রীরামপুর ষ্টেশন ছাড়িলে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং শীতটুকু বেশ প্রচণ্ডভাব ধারণ করিল। আমাদের আনন্দের স্রোত, তখন, বরফের মত, জমিয়া আসিতেছিল।

কায়ক্লেশে বর্দ্ধমানে কন্যাপক্ষের বাটী পৌঁছিলাম। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। বরযাত্রীদিগের রাত্রিবাসের জন্য তাঁহারা সম্মুখের একটি বাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা ছিল—বৃষ্টিতে আসর তেমন জমিতে পারিল না। আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম-বাটিতে গেলাম। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জ্জন ও বিদ্যুতের চমক উৎসবানন্দের পরিবর্ত্তে বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছিল। আমাদিগের অপরিচিত একটি যুবক,—বোধ হয়, কন্যাপক্ষীয়,—বলিয়া উঠিল, "কি দুর্য্যোগ! ভূতপ্রেতেই এ দুর্য্যোগে শুধু বাহির হয়, মানুষ পারে না! নিমন্ত্রণের জন্যও না।"

হলঘরের কোণে বসিয়া একটি ভদ্রলোক তামাকু সেবন করিতেছিলেন—বিপুল দাড়ী গোঁফ তাঁহার মুখটাকে একেবারে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। মাথায় প্রকাণ্ড চুল—অর্থাৎ দেখিলে তাঁহাকে থিয়সফিষ্ট কিম্বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের লোক বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নামটা, বুঝি, রতনবাবু,—পরিচয়ে জানিয়াছিলাম—রতন বাবু বলিলেন, "বলেন কি মশায়—! ভূতগুলার কি কাণ্ডজ্ঞান নাই যে, এই দুর্য্যোগে মরিবার জন্য বাহির হইবে!"

কক্ষমধ্যে হাস্যের তরঙ্গ উঠিল! আমি কহিলাম, "ভূতেরও মরিবার ভয় আছে নাকি?"

রতন বাবু বলিলেন, "তারা এ দুর্য্যোগে বাহির হয় না—জ্যোৎস্না রাত্রিটারই তারা পক্ষপাতী।"

অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "আপনার সঙ্গে তাদের কথাবার্ত্তা হয়েছিল বুঝি?"

রতনবাবু কহিলেন, "নিশ্চয়—!"

অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "ভূত! যার অস্তিত্বই নাই—তাই দেখিয়াছেন! আশ্চর্য্য!"

রতনবাবু কহিলেন, "ও বয়সে সবই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়! যদি আপনাকে দেখাইতে পারি—?"

অপরিচিত যুবকটি বাধা দিয়া কহিলেন, "আর, যদি না পারেন?"

"না পারি?" রতনবাবু পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া কহিলেন, "আমার নিকট নোটে-টাকায় আটচল্লিশ টাকা আছে, তাহা হইলে এগুলি আমি আপনাকে দিব।"

আমাদের দলের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "রীতিমত বাজি!"

অপরিচিত যুবকটি হাসিয়া কহিল, "আমার কাছে অত কিছু নাই—আসিয়াছি, বিবাহের নিমন্ত্রণে—সঙ্গে তিন-চারটি টাকা ত মোটে আছে।"

রতনবাবু কহিলেন, "তবে আর মিছা বাজি রাখিয়া কি

হবে?" হোষ্টেলের দল মাতিয়া উঠিল। আমরা কহিলাম, "দেখান্ ভূত—আমরা চাঁদা দিয়া বাজি রাখিব!"

রতনবাবু হুঁকা নামাইয়া, হাসিয়া কহিলেন, "যখন বাজির কথাই হল, তখন টাকা বার করুন। তা ছাড়া, তর্কটা ওঁর সঙ্গে হচ্ছে, যখন—"

"বেশ!" বলিয়া সকলে পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিলাম। চাঁদায় পঞ্চাশ টাকা উঠিল। অপরিচিত যুবকের হাতে দিয়া কহিলাম, "রাখুন মশায়, টাকা, আপনিই রাখুন। যদি ভূত দেখাইতে পারেন ত সব উনি লইবেন, আর যদি না পারেন ত, উঁহার আটচল্লিশ টাকা আমরা ভাগ করিয়া লইব।"

রতনবাবু কহিলেন, "খুব ভাল কথা!"

আমরা কহিলাম, "তা হলে, এখনই ভূত দেখাবেন ত?"

দলের মধ্যে একজন ছিল—যাদব মিত্র, এখন সে ব্যারিষ্টার—তার ভূতের ভয় ছিল। সে কহিল, "তোমরা কি ঘুমাতে দেবে না? ভূতের হাঙ্গামা বাধাইয়া তুলিল!"

আমরা তখন উৎসাহে মত্ত—বেচারার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না।

রতনবাবু কহিলেন, "ওঁর যখন ভয় আছে, তখন এখানে ও সব হাঙ্গামা না করাই ভাল, শেষ—"

আমরা কহিলাম, "কোথায়, তবে যাব, এই জলে, কাদায়?"

কন্যাপক্ষীয় একটি ভদ্রলোক আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য

উপস্থিত ছিলেন,—তিনি কহিলেন,—"দু রশিটাক দূরে বাঙলা স্কুল আছে, সেখানে গেলে হয় না ?"

"খুব ভাল হয়—" বলিয়া রতনবাবু অগ্রসর হইলেন। আমরাও পশ্চাতে চলিলাম। কাদা বা জলের জন্য, তখন আর এতটুকু দ্বিধা ছিল না। বিবাহবাটী হইতে গীতধ্বনি শুনা যাইতেছিল।

বাঙলা স্কুল খুলাইয়া কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি, দালানে, বেঞ্চ টানিয়া আমাদিগকে বসাইলেন।

অপরিচিত যুবকটিকে লইয়া রতনবাবু পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জানালা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই চেয়ারে বসুন !" তিনি চেয়ারে বসিলে, রতনবাবু বাহিরে আসিলেন, কহিলেন, "আমরা বাহিরেই থাকিব—ঘরটি বাহির হইতে বন্ধ থাক্—"

বাহিরের খোলা জানালা দিয়া হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছিল—আমাদিগের হাড় অবধি কাঁপিয়া উঠিতেছিল ! কিন্তু সে দিকে আমাদিগের লক্ষ্যও ছিল না। ঘরের মধ্যে কি হয়, দালানের জানালা দিয়া, আমরা তাহাই দেখিতেছিলাম। রতনবাবু বলিলেন, "আপনি বসিয়াছেন ত ! কোন ভয় করিতেছে না ?"

তিনি কহিলেন, "আপনার ও সব বুজরুকি গৎ রাখিয়া, চাক্ষুষ প্রমাণ দেখান, দেখি ?"

রতনবাবু বলিলেন, "বেশ ! বাহিরের জানালার দিকে চাহিয়া দেখুন—কি দেখিতেছেন ?"

তিনি কহিলেন, "বিদ্যুতের চমক—আর অস্পষ্ট গাছপালা—"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

"বেশ—বাহিরের দিকেই চাহিয়া থাকুন"—বলিয়া রতনবাবু ক্ষিপ্র সুরে খানিকটা ছড়া বলিয়া গেলেন—"জঙ্গল ফুঁড়ে, আয়রে উড়ে—" ধরণের প্রকাণ্ড এক ছড়া!

ছড়া শেষ হইলে রতনবাবু কহিলেন, "কি দেখিতেছেন ?"

ভিতর হইতে তিনি কহিলেন, "বাহিরে, জানালার ধারে খানিকটা ধোঁয়া—!"

আমরা উদ্‌গ্রীবভাবে সেদিকে লক্ষ্য করিলাম—কিছু দেখিতে পাইলাম না। কহিলাম, "কই মশায়, কিছুই দেখিতেছি না ত।"

রতনবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "চুপ!" তারপর কহিলেন, "আচ্ছা, আপনার ভয় হইতেছে ?"

"ধোঁয়া দেখিয়া ভয় ?"

রতনবাবু আবার খানিকটা ছড়া বলিয়া কহিলেন, "এবার কি দেখিতেছেন ?"

"ধোঁয়াটা উপরে উঠিয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছে—তাহা হইতে একটা মানুষের মূর্ত্তি! এ কি, এ যে আমার এক বন্ধু—"

রতনবাবু কহিলেন, "বন্ধু ? ইনি জীবিত আছেন ?"

"না,—আজ তিন বৎসর—বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন।" আমরা আশ্চর্য্য হইলাম।

রতনবাবু কহিলেন, "এখন আপনার ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস হইতেছে ?"

"বলেন কি, এটা আমার দৃষ্টিবিভ্রম ত হইতে পারে।"

আমরা অস্থির হইয়া উঠিতেছিলাম। এত বড় অবিশ্বাসী লোক! ভূত দেখিতেছে, তবু মানিবে না! আর আমরা চাঁদা দিয়া মোটে দেখিতেই পাইলাম না! গা-টা ছম্‌-ছম্‌ করিতেছিল—থাকিয়া-থাকিয়া দেহে রোমাঞ্চ হইতেছিল!

"দৃষ্টিবিভ্রম! বেশ! তবে আর একটু দেখুন" বলিয়া রতনবাবু আবার ছড়া সুরু করিলেন, কহিলেন, "এখন কি দেখিতেছেন?"

"লোকটার কেমন ছায়ার শরীর—আমার দিকে আসিতেছে,—আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে,—হাত তুলিতেছে—আমার গায়ের দিকে—ভারী ঠাণ্ডা হাত—উঃ, যেন ছুঁচ বিঁধিতেছে—বাবারে!" অপরিচিত যুবকটি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া সশব্দে ভূমিতে পড়িয়া গেল!

আমরা তাড়াতাড়ি ভিতরে যাইলাম! 'জল, জল' শব্দে স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিল! রতনবাবু বলিলেন, "দু পাতা ইংরাজী পড়িয়া ভূত মানেন না—দেবতা মানেন না—ধরাকে সরা জ্ঞান করেন—এ রোগের ঔষধ কি? তা যাক্, বাজি জিতিয়াছি—আমার টাকার প্রয়োজন নাই—উঁহার যে শিক্ষা হইয়াছে, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট! আপনারা নব্যের দল,—আপনারাও ত চক্ষে দেখিলেন!"

আমরা তখন মুর্চ্ছিতকে লইয়া ব্যস্ত হইলাম। জ্ঞান-সঞ্চার হইতেই, অপরিচিত যুবকটি কহিলেন, "কোথায় গেল, সে বেটা! ভণ্ড, বুজরুক! উঃ, আমার প্রাণটাই গিয়াছিল—আমি তাকে পুলিশে দিব, এখনই থানায় টানিয়া লইয়া যাইব,—বেটা—"

কথাটা বলিতে বলিতে তিনি বাহিরের দিকে ছুটিলেন।

আমরা সকলে মিলিয়া চেয়ার-টেবিলগুলা তুলিয়া, বাতি জ্বালিয়া বাসার দিকে চলিলাম! কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি কহিলেন, "তাই ত, ব্যাপারটা ভাল, বুঝা গেল না ত!"

বাসায় আসিয়া দেখি, যাদব মিত্র আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। আমবা ফিরিতেই সে কহিল, "কি দেখিলে?"

আমরা কহিলাম, "আশ্চর্য্য কাণ্ড! যথার্থই ভূত আছে! তিন বৎসর পূর্ব্বে যে লোক মারা গিয়াছে, সে একেবারে আজ সশরীরে উপস্থিত!"

যাদব কহিল, "স্বচক্ষে দেখিলে?"

আমরা কহিলাম, "স্বচক্ষে ঠিক নয়—তবে, হাঁ, একরকম স্বচক্ষু বই কি! সেই যে ভদ্রলোকটি যিনি তর্ক করিতেছিলেন, তিনি দেখিয়া ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন!"

যাদব কহিল, "মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে?"

আমরা কহিলাম, "হাঁ!"

"কোথায়, তিনি?"

"এখানে ফিরিয়া আসেন নাই?"

"না!"

"রতনবাবুও এখানে ফিরেন নাই?"

"কই না!"

"তবে বুঝি বিবাহবাড়ীতে গিয়াছেন! সে ভদ্রলোকটি ত এমন চটিয়া উঠিয়াছেন, যে ভয় দেখানোর জন্য, রতনবাবুকে পুলিশে দিবেন বলিয়া শাসাইয়া তাঁহারই সন্ধানে গিয়াছেন!"

৩

গল্পে-গুজবে সময় কাটাইবার পর, শেষ রাত্রে আমাদিগের নিদ্রা আসিল। প্রভাতে, নিদ্রাভঙ্গে রতনবাবুদের সন্ধান লইলাম —তাঁহাদের চিহ্নও নাই! ব্যাপার কি!

চা-মিষ্টান্ন প্রভৃতি লইয়া কন্যাপক্ষীয় ভদ্রলোকটি আসিয়া কহিলেন, "আপনাদের দলের তাঁরা কোথা গেলেন! সেই ভূত! তাঁদের দেখিতেছি না ত!"

আমরা কহিলাম, "কই এখানে ত, আসেন নাই! আর, তাঁরা ত আমাদের দলের নন! কন্যাযাত্রী!"

"না! কন্যাযাত্রী হবেন কেন? তাঁরা আপনাদের আসিবার পূর্ব্বেই, আসিয়া সন্ধান লইয়াছিলেন, বরযাত্রীর দল আসিয়াছে কি না—বরযাত্রী বলিয়াই ত পরিচয় দিয়াছিলেন!"

আমরা আকাশ হইতে পড়িলাম। তবে কি—! ভাল কথা, আমরা চাঁদা করিয়া পঞ্চাশটি টাকা যে সেই অপরিচিত যুবকটির হাতে রাখিয়াছিলাম!

রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল। থানায় ষ্টেশনে লোক ছুটিল! সংবাদ আসিল, রাত্রে কুলির দল গোঁফ-দাড়ী-সমাচ্ছন্ন একটি লোককে এক যুবা সঙ্গীসহ, ষ্টেশনে, প্ল্যাটফর্ম্মের বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, তার পর যে, তাহারা কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না!

আশা-হত।

১

বড়দিনের ছুটি ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তাসের ব্রে খেলা চলিতেছিল। ইস্কাবনের বিবির ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এমন সময় প্রভাস আসিয়া উপস্থিত।

আমি কহিলাম, "কি হে, কি মনে করে?"

প্রভাস কহিল, "বিশেষ দরকার আছে। একটু নিরিবিলিতে বলব।"

সে বাজি খেলা শেষ হইলে প্রভাসকে লইয়া পার্শ্বের নিভৃত কক্ষে গেলাম।

প্রভাস কহিল, "একখানা নাটক লিখেছি!"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "আমাকে বুঝি সমজদার পেয়েছ, তার? হায়, হায়!"

প্রভাস একটু অপ্রতিভভাবে কহিল, "তা নয়, তবে তোমার সঙ্গে না ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের ম্যানেজারের আলাপ আছে, কুঞ্জ বলছিল—তাই যদি একবার তাদের দেখিয়ে সুবিধা করে দিতে পার! তা ছাড়া, তোমাকেও একবার দেখাতে চাই, তোমার মতটা জানবার জন্য! কাউকে পড়িয়ে শোনাই নি' এখনও!"

আমি গণিতের অধ্যাপক। সাহিত্যরসের আস্বাদ-বোধ কি আমার সাধ্য! প্রভাসের কথায় মনে একটু গর্ব্ব হইল! আমি

কহিলাম, "বেশ কথা—আজ রাত্রে পড়া যাবে! এখানেই খাওয়া-দাওয়া কর—সে সময়টা বেশ নিরিবিলিও থাকি!"

মলিন শালের মধ্য হইতে একখানি মোটা বাঁধানো খাতা লইয়া প্রভাস আমার হাতে দিল—আমি সেটি টেবিলের ড্রয়ারে রাখিয়া দিলাম।

প্রভাস আমার সহপাঠী! ক্লাশে তাহার সহিত বরাবর আমার প্রতিদ্বন্দিতা চলিত! প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে পনেরো টাকা বৃত্তি পাইয়া আমাকে পরাস্ত করিয়াছিল। সেই আক্রোশে আমার ছাত্রজীবন এমন কঠোর সাধনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপহারগুলি আমার হাতে তুলিয়া দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নাই!

বি, এ, পরীক্ষার ব্যূহভেদ করিতে না পারায় প্রভাসের ছাত্র-জীবনের গতি মন্থর হইয়া পড়িল!

বাঙ্গালা সাহিত্যের নেশা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! ছেলে-বেলা হইতেই কেমন-একটা স্বপ্নময় ভাব তাহাকে ঘেরিয়া থাকিত। ক্রমে সেই ভাব তাহার চারিধারে এমন একটি সুনিবিড় জাল রচনা করিল যে, পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাহার অনুরাগ শিথিল হইয়া আসিল! কাব্যের ইন্দ্রজালময় রহস্যলোকে তাহার চিত্ত কিসের সন্ধানে ফিরিত, সেখানে সে কি সুখের স্বাদ পাইত, তাহা আমরা ধারণাও করিতে পারিতাম না! তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন পাষাণ-ভবনের দ্বার তাহার বিরুদ্ধে রুদ্ধ হইলেও, কল্পনার

কমলবনে বাণীদেবী তাহার জন্য স্নেহ-আসন বিছাইয়া দিতেছিলেন! সহসা একদিন দেখা গেল, তাহার বন্ধুবান্ধব যখন ছাত্রজীবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সে সাহিত্যক্ষেত্রে তাহার কুহক-রচনার মধ্য দিয়া একটা সুপ্রতিষ্ঠ স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে এতটুকু অগ্রসর হইতে পারে নাই!

সাহিত্য আর যে আনন্দই দান করুক না কেন,—শূন্য উদর কিম্বা দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস হইতে পরিত্রাণ-লাভের কোন পন্থাই সে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না। অবশেষে একদিন বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের জন্য বাঙ্গালার উদীয়মান সাহিত্যিক সংবাদ-পত্রের অফিসে কর্ম্মের উমেদার হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল! লক্ষ্মীদেবী কৃপা করিলেন—সহজেই প্রভাসের চল্লিশ টাকা মাহিনার একটা চাকুরি মিলিল!

কিন্তু এ কি অসহ্য দুঃখ! তীব্র পরিহাস! মন যখন কল্পনা-কুঞ্জে পুষ্প-সুরভির জন্য আকুল হইয়া উঠে, গোপন ঊর্দ্ধলোকে আদর্শের সন্ধানে ফিরে, কর্ত্তব্য তখন খুন-তদারকের বীভৎস রিপোর্ট লিখিবার জন্য তাগাদা দেয়! ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সারসঙ্কলন, গরিলা-বনমানুষের বিচিত্র বার্ত্তা-সংগ্রহ, ও গ্রীণলণ্ডের রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া এমন একঘেয়ে হীন জীবনও ত বহন করা যায় না! কিন্তু উপায় নাই! লোকে আদর্শ বা কাব্য পড়িতে চাহে না, কারণ, তাহা দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। কাজকর্ম্মের অবসরে এইরূপ দুই-চারিটা উদ্ভট সংবাদ পাইলেই তাহারা কৃতার্থ হইয়া যায়!

রাত্রে প্রভাস কহিল, "খপরের কাগজে ত আর টেঁকা যায় না—জীবনে যেন ক্রমেই কালো কালি মাখছি! চাকরি রাখা দুষ্কর হয়েছে!"

প্রভাস পরচর্চ্চা বা গ্লানির কথা লিখিতে পারে না, কড়া দুই চারিটা সমালোচনায় সহযোগীর প্রতিষ্ঠা সে দূর করিতে পারে না, তোষামোদ করিয়া লেখনীর সাহায্যে ধনীর শিরে পুষ্পবৃষ্টিও সে করিতে পারে না, কাজেই স্বত্বাধিকারী বিরক্ত, পাঠকের দলও আগ্রহশূন্য!

প্রভাস কহিল, "শুনেছি থিয়েটারওলারা পয়সা দিয়ে বই নেয়—মোটা বাঁধা মাহিনাও দেয়—তাই বহু চেষ্টায় এই নাটক লিখেছি!"

আমি কহিলাম, "তুমিও যেমন—থিয়েটারে কেবল হীন রুচি, সেখানে নাটক জোগানো কি তোমার মত লোকের কাজ! কতকগুলো পচা অশ্লীল ইয়ারকি, আর নাটকের মাথায় লাঠি মেরে সেখানে নাটক লিখতে হয়!"

প্রভাস কহিল, "তবু তুমি একবার দেখ না!"

প্রভাস নাটক পড়িতে লাগিল—নাটকের নাম, "রাজকন্যা।" যেখানে যেমন প্রয়োজন, তেমন ভাবভঙ্গীর সহিত সুর খেলাইয়া সে স্বরচিত নাটক পড়িতে লাগিল! রচনায় এমন একটা আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, আমার নীরস গণিতচর্চ্চারত মস্তিষ্কও মুগ্ধ হইয়া গেল! করুণরসের স্নিগ্ধ ধারায় আমার চিত্ত আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইতেছিল, অজানা

লোকের দুঃখিনী রাজকন্যার মর্ম্মবেদনায় অন্তরটা হা-হা করিয়া উঠিতেছিল! যখন নাটক-পাঠ শেষ হইল, তখন আমার মনে হইল, যেন এতক্ষণ একটা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম!

সাহিত্যের সহিত আমার কোন সংশ্রব ছিল না, তবু এটুকু বুঝিলাম, যাহা সচরাচর পাঠ করা যায়, "রাজকন্যা" তেমন নহে! ইহাতে যাহা আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না! চরিত্রগুলিতে একটা অসাধারণত্ব ছিল!

আমার পিতৃব্য ইণ্ডিয়ান থিয়েটারের এটর্ণি ছিলেন। সেই সূত্রে ম্যানেজারের সহিত আমার অল্প আলাপ ছিল!

প্রভাসকে লইয়া ম্যানেজার রামকালীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। সুদক্ষ অভিনেতা ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামকালীবাবুর নাম আর কে না শুনিয়াছে? রীতিমত আগ্রহের সহিত রামকালীবাবু প্রভাসের নাটকখানি হাতে লইলেন। বলিলেন, "দশ বারো দিন পরে সংবাদ দিব।"

আমি তাহাকে অন্তরালে লইয়া গিয়া কহিলাম, "বহিখানা সাধারণ নাটকের মত নয়।"

রামকালীবাবু বলিলেন, "প্রভাসবাবুর নাম শুনা আছে।"

দুই সপ্তাহ পরে রামকালীবাবুর বেহারা আসিয়া আমাকে একখানি পত্র দিল! পত্রের মর্ম্ম,—প্রভাসবাবুর নাটক সাহিত্য-

হিসাবে সুন্দর হইলেও অভিনয়ে তেমন জমিবে না—দৃশ্যপটাদি অঙ্কনেও বিস্তর ব্যয় হইবে। নূতন গ্রন্থকারের জন্য সহসা এত টাকা ব্যয় করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় না। ওথেলা হ্যামলেটও আজকাল অভিনীত হইলে দর্শক জুটে না—প্রভাসবাবুর নাটক দৃশ্যকাব্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী নহে। কাজেই তিনি দুঃখের সহিত নাটকখানি ফেরত পাঠাইয়াছেন।

প্রভাস প্রত্যহই আপনার অদৃষ্ট-ফলের কথা জানিবার জন্য আমার নিকট আসিত। সেদিনও আসিয়াছিল। রামকালীবাবুর পত্র দেখিয়া সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। কোন কথা না বলিয়া সে খাতাখানি লইয়া চলিয়া গেল! আমি ডাকিলাম, কিন্তু সে ফিরিয়াও একবার চাহিল না! বেচারার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল!

এই সময় চৌবাড়ীর জমিদার ক্ষিতীশ চৌধুরী এক সখের থিয়েটারের দল খুলিল। তাহারা নূতন নাটকের সন্ধান করিতেছিল। আমি প্রভাসের নাটকের কথা বলিতে সে পাঁচ শত টাকা দিয়া নাটকের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইতে উদ্যত হইল! আমি গিয়া প্রভাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা বলিলাম।

প্রভাস কহিল, "সে খাতা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি!"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। "সে কি? তার নকল নাই?"

"না—তার কোন চিহ্ন রাখিনি! ব্যর্থতার সাক্ষ্য রেখে লাভ কি?"

ক্ষোভে আমার অন্তর ভরিয়া উঠিল!

প্রভাস কহিল, "কাল আমি ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে গেছলাম—নাটক দেখতে। যা দেখলাম—কদর্য্য!"

আমি কহিলাম, "রামকালীবাবুর নাটক?"

"না।"

"রামকালীবাবুর নাটক একদিন দেখে এস, কি রকম ধরণটা ওরা চায়!"

"দাসত্ব করতে বল, তুমি?"

"তা নয়, ঠিক! তবে ষ্টেজের জন্যই যদি লেখ, তা হলে ষ্টেজকে একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? এতগুলো দর্শকের রুচি তুমি ত আর একরাত্রেই হঠিয়ে দিতে পারচ না!"

"তা বলে তাদের কুৎসিত রুচির অনুসরণ করতেও পারব না—এতে না খেয়ে সপরিবারে মরি যদি, সে-ও ভাল!"

৩

কিছুদিন পরে প্রভাস আসিয়া আবার সহসা দর্শন দিল। কহিল, "আজ থিয়েটারে যাবে? একখানা নূতন বই আছে।"

থিয়েটার দেখার প্রতি আমার কোন ঔৎসুক্য ছিল না; রাত্রি জাগরণ সহ্য হইত না,—তাহার উপর হেদুয়ার ধারে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া দেখিতাম, সারারাত্রি, অন্ধকূপের মত, বায়ু ও আলোক-হীন, থিয়েটার-গৃহে থাকিয়া প্রভাতে দর্শকের দল শীর্ণ মুখে শুষ্ক চোখে গৃহে ফিরিতেছে—এই নিষ্ঠুর আমোদ-প্রিয়তা দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিতাম। থিয়েটারের নামে আমার কেমন আতঙ্ক জন্মিয়াছিল।

তাই আমি কহিলাম, "সারারাত্রি গারদঘরে আটক থাকা আমার দ্বারা পোষাবে না !"

প্রভাস কহিল, "সারারাত্রি না-ই বা থাকলাম—একখানা নূতন নাটকের অভিনয় হবে—রামকালীবাবুর লেখা !"

একখানিমাত্র নাটক ! "জেলে খুন", "কালো ভূত" প্রভৃতি গীতিনাট্য ও প্রহসনে পাঁচ ফুলের সাজির ব্যবস্থা হয় নাই শুনিয়া আশ্চর্য্য ও আশ্বস্ত হইলাম !

প্রভাস আরও কহিল, "রামকালীবাবুর লেখার ধরণটা কেমন —দেখব !"

আমি কহিলাম, "কি নাটক ?"

প্রভাস একখানা হ্যাণ্ডবিল ফেলিয়া দিল ! কেমন করিয়া আত্ম-প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে হয়, হ্যাণ্ডবিলখানি তাহার চূড়ান্ত পরিচয় ! এমন নাটক আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই—নাটকের রাজ্যে একেবারে যুগান্তর উপস্থিত ইত্যাদি বাগাড়ম্বরের ত্রুটি নাই এবং খুব মোটা চিত্র-বিচিত্র অস্পষ্ট অক্ষরে নাটকের নাম লেখা—"কমলাবতী"—নূতন ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নায়ক বিনায়ক সাজিবেন, নাট্যকার স্বয়ং,—বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের আর্ভিং, শ্রীযুক্ত রামকালী হালদার।

রাত্রে ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম। দুইখানি টিকিট কিনিয়া ভিতরে গেলাম। কি ভিড় ! কলিকাতার যত লোক যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একই রাত্রে এত লোকের থিয়েটার দেখিবার সখ জাগিয়া উঠিয়াছে, ভাবিয়া আমি স্তম্ভিত

হইয়া গেলাম। রামকালীবাবু গর্ব্বস্ফীত বক্ষে টিকিট-ঘরের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন—আমরা সাবধানে তাঁহার দৃষ্টিটুকু এড়াইয়া আসিলাম।

ঐক্যতান বাদনের পর পটোত্তোলন হইল। প্রথম দৃশ্যে এক সুবিস্তীর্ণা নদী—দুই কূল দেখা যায় না! নদীবক্ষে একখানি সুদৃশ্য তরণী! তরণীর উপর বসিয়া রাজকন্যা কমলাবতী বাঁশী বাজাইতেছেন! দৃশ্যপটের আড়ম্বরে ও রাজকন্যার সুদক্ষ বাঁশীর সুরে কেমন-একটা বিভ্রম আনিয়া দিল! তাহার পর নানা ঘটনার মধ্য দিয়া নাটকের গতি ত্বরিতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিল। দুই-চারিটা দৃশ্যের পর আমি চমকিয়া উঠিলাম,—এ যে প্রভাসের নাটক! কেবল নামগুলাতে ও দৃশ্য-যোজনায় একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে! রচনার ভাব, ভঙ্গী, উপাখ্যানের অভিনবত্ব, সমস্তই প্রভাসের। আশ্চর্য্য হইয়া আমি প্রভাসের দিকে চাহিলাম। অভিনয়ের মধ্যে সে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইলে প্রভাস কহিল, "আমার 'রাজকন্যার' মত মনে হচ্ছে, না?"

আমি কহিলাম, "হুবহু তাই বলে ত আমার মনে হয়।"

চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া প্রভাস সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। আমি কহিলাম, "আর একটু দেখা যাক। ভদ্রতায় না হয়, কোর্ট আছে।" প্রভাস কোন কথা কহিল না।

তারপর দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হইল! কথাবার্ত্তায়, ভাবে-ভাষায়

এতটুকু আর প্রভেদ রহিল না—হুবহু প্রভাসের রচনা। কেবল নামগুলা বদলাইয়া দিয়াছে মাত্র।

অভিনয় দেখিতে দেখিতে দর্শকের দল মাতিয়া উঠিল। এমন নাটক বাঙ্গালা থিয়েটারে কখনও অভিনীত হয় নাই। যেমন উচ্চ ভাব, গানগুলিতে তেমনই কবিত্ব,—থিয়েটারী সাহিত্যে যে দুইটি জিনিস একান্ত দুর্লভ।

পার্শ্বস্থ জনৈক দর্শক কহিল, "রামকালীবাবু কি আশ্চর্য্য নূতন ভাবে লেখার স্রোত ফিরিয়েছেন।"

আর একজন কহিল, "প্রতিভার লক্ষণই ত এই।"

প্রভাস ক্ষেপিয়া উঠিল। সে কহিল, "চুরি! আমার লেখা বেমালুম চুরি করেছে!"

লোক দুইজন অবাক হইয়া গেল! এমন অদ্ভুত কথা শুনিবে বলিয়া তাহারা মনেও আশাও করে নাই!

আমি কহিলাম, "কথাটা সত্য!"

তাহারা কহিল, "বলেন কি, মশায়?"

উৎসাহী দর্শকের সঘন করতালিবর্ষণে প্রভাস অস্থির হইয়া পড়িল!

তখন তৃতীয় অঙ্ক চলিতেছিল। দৃশ্যটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। নায়ক বিনায়ক যুদ্ধ জয় করিয়া আসিয়াছে—রাজা হংসবাহন বিপুল ভাবনা ও দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন—জয়মাল্য লইয়া রাজকন্যা কমলাবতী সম্মুখে উপস্থিত। এমন সময় ষড়যন্ত্রকারী কতিপয় রাজ অনুচরের প্রচুর প্রমাণে বিনায়কের বিশ্বাসঘাতকতার

পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—রাজা শিহরিয়া বিশ্বাসঘাতকের দণ্ডবিধান করিলেন! রাজকন্যার কর হইতে পুষ্পমাল্য খসিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইল। এ অসম্ভব কথায় সভাসদগণ অবাক হইয়া গিয়াছে। রাজা নিরুপায়, প্রমাণ পাইয়া দোষীর দণ্ডবিধান না করিলে কর্ত্তব্যহানি হইবে! বিনায়ক অবিচলিত হৃদয়ে সমস্ত অপবাদ মাথায় বহিয়া কারাগৃহে যাইবার সময় ধীরস্বরে করুণ আক্ষেপবাণীতে দর্শকের হৃদয় আর্দ্র করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় প্রভাস দাঁড়াইয়া উঠিল।

পিছন হইতে অধীর দর্শকের দল এক সঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল, "আঃ, বসুন না, মশায়—আপনি ত transparent নন যে, দেখতে পাব!"

প্রভাস রূঢ়স্বরে কহিল, "চোর—চোর! আমার বই চুরি করেছে—নির্লজ্জ চোর কোথাকার!"

আকস্মিক রসভঙ্গে অভিনেতাও স্থির হইল। চারিধারে রীতিমত গোল বাধিয়া গেল! গ্যালারি হইতে চীৎকার উঠিল, "দূর করে দাও, মাতালটাকে—দূর করে দাও!

আমি প্রভাসের হাত ধরিলাম! প্রভাস কহিল, "বল, তুমিই বল, চুরি কি না! আমি মাতাল নই, পাগল নই—এ নাটক আমার লেখা। রামকালীবাবুকে দেখতে দেওয়া হয়েছিল—তিনি ফেরত দিয়ে বলেন, ভাল হয়নি—তারপর সেই বই নিজে আগাগোড়া চুরি করে নিজের নামে চালিয়েছেন—চোর কোথাকার! প্রমাণ অবধি রাখিনি, আমি! ওঃ! সে খাতা পুড়িয়ে ফেলিছি!"

'দূর করে দাও,' 'পাগল,' 'মাতাল' শব্দে চারিধারে যেন বজ্রনিনাদ উঠিল ! মধুচক্রে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে যেমন হয়, ভাবখানা তেমনই দাঁড়াইল !

নায়ক বিনায়ক মঞ্চ হইতে হাঁকিলেন, "গার্ড !"

ষ্টলের গার্ড আসিয়া প্রভাসের হাত ধরিল। প্রভাস কহিল, "ছেড়ে দাও—অসভ্য, বেয়াদব্।"

প্রভাসকে শান্ত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। থিয়েটারের দুইচারিজন লোক আসিয়া প্রভাসের গলা ধরিয়া ধাক্কা দিল। আমি কোনমতে গোল থামাইয়া প্রভাসকে লইয়া বাহিরে আসিলাম !

রাস্তার ধারে আসিয়া গাড়ীর সন্ধান করিতেছি, এমন সময় ভিতরে তুমুল রবে করতালির ধ্বনি উঠিল। প্রভাস তখন আমার বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল।

আলেয়া।

১

কৃষ্ণনগরের উকিল হরনাথ বসু জমিদার-ঘরে বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়া বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছিলেন! মিষ্টকথা ও মিষ্টান্নে জমিদার-বেহাইনের কোন দিন মনস্তুষ্টি করিতে ত তিনি পারিতেনই না, তাহার উপর গঞ্জনার বাণী চিরদিনই সমভাবে সহ্য করিতেছিলেন।

মেয়েটী শ্বাশুড়ীর তীব্র শ্লেষোক্তিতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া যখন মাতাকে লিখিল, "মা, [illegible] দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে যেমন করে হোক, একবার নিয়ে যাও, আমার বড় মন কেমন করে," তখন স্নেহশীলা মার প্রাণ একান্তই কাতর হইয়া উঠিল। পত্নীর সবিশেষ অনুরোধে জমিদারের মোটা থাম ও প্রকাণ্ড গেটযুক্ত অট্টালিকায় মাথা গলাইয়া হরনাথ নানাবিধ কাতর উপরোধেও তাঁহার আদরিণী অভিমানিনী কন্যা সুরমাকে দুইদিনের জন্যও স্বগৃহে আনিবার অনুমতি পাইলেন না, বরং তাহার পরিবর্ত্তে বড় মানুষ কুটুম্বিনীর নিকট বেশ চড়া রকমের পাঁচ কথা শুনিয়া ঘরে ফিরিলেন। সেইদিন তিনি স্থির বুঝিলেন যে, আপনার চেয়ে বড় ঘরে কুটুম্বিতা করা মহাপাপ! পর ত আপন হয়ই না, তাহার উপর আপনটিও পর হইয়া যায়! ইহা অপেক্ষা ছোট ঘরে কাজ করাই শ্রেয়স্কর।

এই সিদ্ধান্ত ও কার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে হরনাথ ছোট মেয়ে প্রমীলাকে গরীবের ঘরে সমর্পণ করাই স্থির করিলেন। নানাস্থানে অনুসন্ধানের পর জারুল গাঁয়ের ভুবন দত্তের পুত্র শচীনাথের সহিত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল!

ভুবন দত্ত পল্লীবাসী গৃহস্থ, গ্রাম্য জমিদার-সরকারে সামান্য চাকুরি করিয়া কোনমতে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন।

পুত্র শচীনাথ রায়গঞ্জে মাসীর বাড়ী থাকিয়া মাইনর স্কুলে পড়া-শুনা করিত। মাসীর পুত্রকন্যা ছিল না, শচীনাথকেই তিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। তাহার পড়া-শুনা খরচ-পত্রের জন্য ভুবন বাবুকে কষ্ট পাইতে হইত না। কখন কখন পুত্রের জল-খাবারের জন্য টাকাটা সিকিটা পাঠাইয়া দিতেন—কার্ত্তিক মাসে নূতন খেজুরে গুড়ের 'পাটালি', 'কুমড়াবড়ি' প্রভৃতি দিয়া ছেলের তত্ত্ব লইতেন মাত্র। একালের ছেলেদের মত শচীনাথের কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। কোনদিন সে পান্তাভাত খাইয়াই স্কুলে যাইত, কোনদিন বা সকাল-সকাল স্নান সারিয়া মেসো মহাশয়ের নৈশভুক্তাবশিষ্ট বুটের ডাল ও রুটিতে মধ্যাহ্নিক এবং গরম মুড়ি ও লঙ্কামরিচে বৈকালিক জলযোগ সম্পন্ন করিত। সুছেলে বলিয়া শচীনাথের পাড়ায় একটা নামডাক ছিল, তাই অদৃষ্টগুণে হরনাথ বসুর চোখে পড়িয়া যাওয়ায় সহসা একদিন তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল।

২

বিবাহের পর হরনাথ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী নব জামাতার পাঠ এবং সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য সকল প্রকার উপায়ই অবলম্বন করিলেন। নির্জ্জনে পাঠের জন্য তাহাকে একটি সুসজ্জিত কক্ষ ছাড়িয়া দিলেন; তাহার ফরমাস খাটিবার জন্য স্বতন্ত্র ভৃত্য নির্দ্দিষ্ট হইল এবং পড়াইবার জন্য যথানিয়মে মাষ্টার আসিতে লাগিল। অর্থাৎ, এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটিকে নাগরিক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের জামাতার যোগ্যবেশে সাজাইবার জন্য অনুষ্ঠানে এতটুকু ত্রুটি রহিল না।

কিন্তু অধিক চটকাইলে লেবু তিক্ত হইয়া যায়। যখন শ্বশুর-শাশুড়ী এত আদর-যত্ন করেন, দাসদাসীগণ এত সম্মান দেখায়, ক্লাশের ছেলেরা তাহার চকচকে বার্ণিশ-করা জুতা, বিচিত্র মোজা, সুন্দর ইস্ত্রি-করা সার্ট এবং পুষ্পশুভ্র কোঁচানো চাদরের দিকে চাহিয়া থাকে, তখন সে আপনার প্রথম জীবনের দারিদ্র্য স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত হয় এবং মেশোমহাশয়ের উচ্ছিষ্ট বাসি রুটির কথা মনে হইলে সে লজ্জায় মরিয়া যায়! এখন সে সঘৃত অন্ন ও গল্‌দা চিংড়ীর মুণ্ড পরিপাক-পূর্ব্বক ডেপুটি বাবুর ভাই ও মুন্সেফ্‌ বাবুর পুত্রের সহিত বাবুগিরিতে সমান "পোজিসান্‌" রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল।

যে সকল ছাত্রের পোজিসান-রক্ষার দিকে ঝোঁক বেশী, সরস্বতীর খাতির তাহাদের দ্বারা সকল সময় সমান রক্ষিত হয় না। ক্রমে এমন হইল যে, শীতের সময় হিমে তাহার

পড়াশুনার ব্যাঘাত হইত এবং গ্রীষ্মের সময় ঘরের মধ্যে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেও সে গায়ের সার্ট খুলিত না, পাছে গাত্র হইতে কোনরূপ পাড়াগেঁয়ে গন্ধ বাহির হইয়া পড়ে!

হরনাথ বাবু একদিন হিতোপদেশ-চ্ছলে এই বিষয়টার প্রতি অল্প ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ মেধাবী জামাতা তাহাতে শ্বশুর মহাশয়ের এই স্নেহাতিশয্যের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া প্রচুর দীর্ঘশ্বাস ও অজস্র অশ্রু-বর্ষণে আপনার ক্ষুব্ধ অভিমান উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। হরনাথ বাবু সে দিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, জামাতাকে আর কখন এরূপ-কিছু বলিবেন না! এতদিনে তাঁহার বিশ্বাস হইল, পরের ছেলে কখনই আপন হয় না, তা সে জমিদারের ছেলে হোক্ আর ভিখারীর ছেলেই হোক!

৩

পুত্রের অদর্শনে শচীনাথের পিতামাতা নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন। শচীনাথ ইদানীং বাড়ীতে চিঠি-পত্র লেখাও প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিল!

অবশেষে পূজার ছুটি হইল। শচীনাথকে গৃহে পাঠাইবার জন্য ভুবন দত্ত হরনাথ বাবুকে বিস্তর অনুনয় করিয়া এক পত্র লিখিলেন। হরনাথ বাবুর ইহাতে অবশ্য এতটুকু আপত্তি ছিল না। জামাতার মতিগতি দেখিয়াও তিনি জামাতাকে আর একবার ভাল করিয়া বুঝাইলেন।

শচীনাথ পিতার এই ঘোরতর বেয়াদপি ও পাড়াগেঁয়েমি দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পর দিনই খুব তাড়া দিয়া পিতাকে সে এক পত্র লিখিল, "সময় নাই, অসময় নাই, কেবলই বাড়ী যাইবার জন্য এত লেখালেখি কেন? আমি কি জলে পড়িয়াছি! এ বৎসর পরীক্ষা দিতে হইবে—এখন পড়া বন্ধ করিয়া পাড়াগাঁয় গিয়া বসিয়া থাকিলেই কি চতুর্ভুজ হইব? মা যে আমাকে দেখিবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। তাঁহাকে বলিবেন, এখন আমি কিছুতেই বাড়ী যাইতে পারিব না।"

পত্র পাইয়া ভুবনবাবু বিস্মিত হইলেন। পুত্রের স্নেহহীন কঠোর কথা শুনিয়া মাতার হৃদয় চূর্ণ হইয়া গেল,—চক্ষুপ্রান্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল,—পাছে অশ্রুপাতে পুত্রের অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বস্ত্র-প্রান্তে নয়ন মুছিয়া কহিলেন, "আহা, চিরকাল পড়া পড়া করেই বাছা আমার অস্থির! পরীক্ষাটা চুকে গেলে আবার আমার ছেলে আমার কোলে আসবে।"

শচীনাথের পরীক্ষা শেষ হইলে, একদিন শাশুড়ী কহিলেন, "তোমার মা তোমাকে দেখবার জন্য বড় অস্থির হয়েছেন—একবার দু-দিনের জন্য ঘুরে এলে হয় না? এখন ত পড়াশুনার ঝঞ্ঝাট নেই!"

ইহার পর একবার বাড়ী না যাওয়া নিতান্তই খারাপ দেখায়! শচীনাথ বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পোর্টম্যাণ্টের ভিতর ইস্ত্রি-করা সার্ট আধ-ডজন, পঞ্জাবি আধ ডজন, খান-কতক কোঁচান ধুতি ও চাদর, আয়না, চিরুণি, ব্রস, সাবান, এসেন্স,

টুথপাউডার প্রভৃতি আসবাব লইয়া শচীনাথ একদিন পিতৃসন্দর্শনে চলিল।

তখন চৈত্র মাস। বসন্ত কাল। প্রকৃতিদেবী পল্লীগ্রামকে অপূর্ব্ব ভূষায় ভূষিত করিয়াছেন। নৌকা হইতে নামিয়া শচীনাথ মাঝির মাথায় পোর্টম্যাণ্ট চাপাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। মাঠের মধ্য দিয়া সরু পথ—উঁচু-নীচু, কোথাও বা আঁকা-বাঁকা! একদিকে যতদূর দেখা যায়, শুধু গোধূমক্ষেত্র,—সুবর্ণ গোধূমশীর্ষ ধরণীর সুকোমল পট্টবস্ত্রের স্বর্ণাভ অঞ্চলের ন্যায় বিছান রহিয়াছে। অন্যদিকে ঘন অড়হর বনের নিবিড় ঝোপের মধ্যে বসিয়া শ্যামা শিষ দিতেছে, দহিয়ালের গানে মুক্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং ফিঙে পুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া খানিকদূর ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিতেছে। অড়হর বনের ধারে একদল কৃষকবালক গুলিডাণ্ডা খেলিতেছিল এবং শিমুলগাছের লোহিত পুষ্প স্তবকের ভিতর হইতে একটা কোকিল 'কু-উ', 'কু-উ' শব্দে উদাস উন্মুক্ত প্রান্তরে আপনার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগপূর্ণ সঙ্গীত লহরী ঢালিয়া দিতেছিল। ক্রমে গ্রামপ্রান্তে, আমবাগানের অন্তরালে সূর্য্য অস্ত গেল!

পুরবধূবর্গের শঙ্খরোলে ও প্রদীপালোকে প্রতি ভবন যখন মুখরিত ও আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক সেই সময়, শচীনাথ আপনার পিতৃভবনে পদার্পণ করিল।

বহুদিন পরে পুত্রকে নিকটে পাইয়া তাহাকে কোথায় রাখিবেন, কি দিয়া আপনার স্নেহতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবেন, তাহা ভাবিয়াই মাতা

আকুল হইয়া পড়িলেন! তাঁহার এই স্নেহাতিশয্য শচীনাথের নিকট নিতান্ত অনাবশ্যক ও বিরক্তিকর বোধ হইল। শচীনাথের ছোট ভাই-বোনগুলি অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের এই বিচিত্র-বেশধারী দাদাটির প্রতি নিতান্ত বিস্ময়-সন্দিগ্ধ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিল—তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে, সে তাহাদেরই একজন! এবং এই ইস্ত্রি-করা শক্ত প্লেটের নীচে কেমন করিয়াই বা একখানি স্নেহকোমল, প্রীতিস্নিগ্ধ হৃদয় থাকিতে পারে! মা যখন কোলের ছেলেটিকে আদর করিয়া কহিলেন, "খোকনমণি, দাদার কাছে যাবে না?" তখন সেই অপরিচ্ছন্ন ধূলিলাঞ্ছিত হস্তপদ বালক কিছুতেই সেদিকে অগ্রসর হইল না, শুধু মায়ের কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া একদৃষ্টে দাদার পানে চাহিয়া রহিল।

৪

পিতৃগৃহে আসিয়া শচীনাথের পদে পদে অসুবিধা হইতে লাগিল। চেয়ার ভিন্ন অন্য আসনে বসা তাহার অভ্যাস ছিল না, —জীর্ণ সতরঞ্চ ও মোটা মাদুর তাহাকে বিষম বিব্রত করিয়া তুলিল। রাত্রে জীর্ণ গৃহে মৃৎপ্রদীপের মিটমিটে আলো তাহার চতুর্দ্দিকে দারিদ্র্যের একটা নিরানন্দময় ম্লান যবনিকা বিস্তীর্ণ করিয়া দিল এবং একখানি ভগ্নপাদ তক্তাপোষ ও মলিন শয্যা মাতৃস্নেহরসে সিক্ত হইলেও কিছুতে তাহার চক্ষে নিদ্রা আনয়ন করিতে পারিল না! তাহার শুধু মনে পড়িতেছিল, শ্বশুরগৃহের

সেই সার্সিখড়খড়িযুক্ত বড় জানালা, দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সম্পদের একটা দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য! শচীনাথ পরদিন শয্যা ত্যাগ করিয়া বলিল, "এখানে আর একদিন থাকৃলে আমি ভেপ্‌সে মারা যাব!" মাতাপিতার সহস্র কাতর স্নেহানুরোধও তাহার শৈশবের ক্রীড়া-ভূমি পল্লীগ্রামে আর একদিন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না!

নির্দিষ্ট সময়ে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ফল বাহির হইল। নিজের, পিতৃপিতামহের ও শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখোজ্জ্বল করিয়া শচীনাথ তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। যাহারা বলিত, বড়ঘরে বিবাহ করিয়া শচীনাথ বহিয়া গিয়াছে, তাহাদের মুখে কালি পড়িল।

এইবার কলিকাতায় পড়িবার পালা! প্রেসিডেন্সি কলেজে না পড়িলে, সুবিধা হইবে না! অগত্যা ডেপুটিবাবুর ভাই, মুন্সেফবাবুর পুত্র প্রভৃতির সহিত শচীনাথ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে চলিল! সকলে মিলিয়া এক মেস খুলিল, নাম দিল—'এঞ্জেল মেস'!

অচিরকাল মধ্যেই শচীনাথ পুরাদস্তুর সহুরে হইয়া উঠিল। ফ্যাসনে, সহুরে ছাত্রগণকে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সাম্য এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বীজ তাহার হৃদয়ে বহুপূর্ব্বেই উপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে অনুকূল জলবাতাসে তাহার উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে তাহা সতেজে গজাইয়া উঠিল এবং পিতামাতার দোষে বাল্যকালে মনের মধ্যে, বিনয়, স্নেহমমতা প্রভৃতি যে সকল আগাছা জন্মিয়াছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল!

এখন পল্লীগ্রামের কথা উঠিলে, তাহার নাসাই সর্ব্বাপেক্ষা কুঞ্চিত হয় এবং দেশের কথা পড়িলে অসঙ্কোচ নিন্দাবাদে তাহার উৎসাহের সীমা দেখা যায় না! কলিকাতায় আসিয়া শচীনাথ বাড়ীতে চিঠিপত্র লেখা একরূপ বন্ধই করিয়া দিয়াছিল। পিতার নিকট হইতে ক্রমাগত পত্র আসিলে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সে দুই এক ছত্রমাত্র উত্তর লিখিত। এখানে ক্রিকেট, ফুটবলের ম্যাচ গানগল্প, মিটিং, থিয়েটার প্রভৃতি লইয়া সে এত ব্যস্ত থাকিত যে, পত্র লিখিবার অবকাশই ঘটিত না!

এদিকে নানাবিধ দুর্ভাবনা ও খেদে শচীনাথের মাতা একদিন রোগশয্যা গ্রহণ করিলেন। তখন ভুবনবাবু পত্নীর সবিশেষ আগ্রহে পুত্রকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া দুই এক দিনের জন্য তাহাকে গৃহে আসিবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিলেন। উত্তরে শচীনাথ লিখিল, "এখন যাইবার সময় একেবারেই নাই!"

ভুবন দত্ত ম্লানমুখে পত্নীর নিকট পুত্রের পত্র পাঠ করিলেন। পত্নী বলিলেন, "না গো, তুমি ভাল করে লেখনি—তাহলে কি আমার অসুখ শুনে, বাছা আমার একবার না এসে থাকৃতে পারত? তুমি নিজে একবার যাও—তাকে নিয়ে এস!" পত্নীর কাতর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ভুবন দত্ত একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুত্রকে আনিবার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন।

৫

সেদিন শনিবার। ক্লাশের নন্দ সিংহের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে আজ বাগানে বন্ধুবর্গকে সে প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। এঞ্জেল-মেসের ছাত্রগণ সাজসজ্জায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও মাথার উপর ঘন ঘন ব্রস চলিতেছে, কেহ দর্পণে মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে কত রকমের মুখভঙ্গী করিতেছে, কেহ দেহাদি মার্জ্জনা করিতেছে, কেহ বা পম্প-সুর ধূলা স্বহস্তেই ঝাড়িতে বসিয়াছে! টেবিলের উপর মিল্ক অব রোজ, সুগন্ধি সাবান, অটো-ডি-রোজ প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। সুগন্ধে কক্ষ পরিপূর্ণ—আনন্দে সকলের হৃদয় ততোধিক পূর্ণ! এমন সময়ে দ্বার-সন্নিধানে আসিয়া পথশ্রান্ত চিন্তাকুল শীর্ণ-দেহ বৃদ্ধ কম্পিতকণ্ঠে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ডাকিলেন, "শচীনাথ,—বাবা—"

গৃহের সমস্ত আনন্দধ্বনি ও হাস্যোচ্ছ্বাস মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল! সকলে অবাক হইয়া সেই মলিনবস্ত্রপরিহিত পল্লীবাসীর ম্লান মুখ ও নিষ্প্রভ চক্ষুর প্রতি কৌতূহল চিত্তে চাহিয়া দেখিল। শচীনাথ নিমেষের জন্য অপ্রতিভ হইয়া পরমুহূর্ত্তেই বৃদ্ধকে ইঙ্গিত করিয়া একধারে একটা নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গেল।

বৃদ্ধ কাতরভাবে কহিলেন, "বাবা, একবার বাড়ী চল—তোমার গর্ভধারিণীর জীবন-সংশয়—তোমাকে একবার দেখবার জন্য বড় ব্যাকুল হয়েছেন—" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শচীনাথের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হৃদয় কিন্তু ইহাতে বিচলিত হইল না! সে

কহিল, "আমি ত লিখেইছি, আমার এখন সময় নেই, আমার এক বন্ধুর বিয়ে, তার জন্য এখন আমি ভারী ব্যস্ত—আজ পার্টি, কাল থিয়েটার—"

পুত্রের হাত ধরিয়া পিতা কহিলেন, "চল, বাবা, নইলে আর দেখতে পাবে না তোমাকে—এ জীবনে আর নয়!" বৃদ্ধের চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল তাঁহার গণ্ড বহিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

শচীনাথ উত্তপ্তভাবে কহিল, "অসম্ভব! আজ আমি পার্টিতে না গেলে সে ভারী দুঃখিত হবে! আমার সঙ্গে তার বড্ড বন্ধুত্ব, আর বিশেষ যখন কথা দেওয়া গেছে, তখন তার নড়চড় করাটা ভদ্রতা হবে না। পারি ত, দুচার দিন বাদে বরং বাড়ী যাব।" কথাটা বলিয়া শচীনাথ সে গৃহ পরিত্যাগ করিল।

একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, "বুড়োটা কে, হে?"

অবজ্ঞার সহিত শচীনাথ কহিল, "ও আমাদের জমিদারের গোমস্তা, কি একটা দরকারে কলকেতায় এসেছে।"

চতুর্দ্দিক আনন্দকলরবে মুখরিত ও এসেন্সের গন্ধে সুরভিত করিয়া সকলে নিমন্ত্রণ-রক্ষায় বহির্গত হইয়া গেল!

বৃদ্ধ ভুবন দত্ত কিয়ৎক্ষণ মাথায় হাত দিয়া কত কি ভাবিলেন, পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা ভগবান।" এই একটি নিশ্বাসে ও একটি মাত্র কথায় তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধ যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিল। পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া তখন ট্রামগাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে, ফেরিওয়ালা জিনিষ-পত্র মাথায় লইয়া হাঁকিয়া চলিয়াছে! চতুর্দ্দিকে একটা কর্ম্ম, ও আনন্দের প্রবাহ

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, শুধু এই নিরানন্দ মর্ম্মাহত বৃদ্ধের হৃদয়ে এক নির্ম্মম পুত্রের হৃদয়হীনতা তীক্ষ্ণ শেলের ন্যায় বিঁধিতেছিল! হায়, এই কি তাঁহার সারাজীবনের আশার অবলম্বন, সেই বিনীত, শান্ত পুত্র!

*　*　*　*　*

পরদিন প্রভাতে পুত্রমুখসন্দর্শন-প্রত্যাশায় উন্মুখী পত্নীর নিকট আসিয়া পুত্রের নির্ম্মম ব্যবহারের কথা বলিতে গিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন। রোগক্লিষ্টা ব্যথিতা রমণীর চক্ষুপ্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার বিশীর্ণ গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল, নিতান্ত আর্ত্তকণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দুঃখিনী বলে কি অপরাধ করেছি, বাবা, যে, একবার দেখা দিলিনে! গরীব বলে কি পেটের ছেলেও পর হল—হা মধুসূদন!"

সন্ধ্যার সময় অভাগিনীর চক্ষুদ্বয় মুদিয়া আসিল। জীবনশক্তি ক্ষীণ হইয়া চারিদিক যখন অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল, তখন প্রিয়তম কণ্ঠের একটি উপেক্ষার বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল, "সময় নেই, সময় নেই!" মুদ্রিতনয়না অভাগিনী মুমূর্ষু কণ্ঠে একবার বলিয়া উঠিলেন, "সময় নেই!"

পুত্রবৎসলা দুর্ভাগিনী নারী যখন পুত্রের এই নির্ম্মম কঠোর উপেক্ষার বাণীটিকে মহাপথের একমাত্র পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করিয়া ইহ জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার 'পাব্লিক-স্পিরিট' পুত্রটি কলিকাতার উৎসবভবনে, সখের

থিয়েটারে, ষ্টেজের পার্শ্ব হইতে রুমাল নাড়িয়া জনৈক অভিনেতার অভিনয়-কৌশল তারিফ করিতেছিল, আর কোন বিষয় ভাবিবার তাহার সময় ছিল না।

মরীচিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীজ-রোপণ।

চৈত্র মাসের শেষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মুলিগাঁয়ের ভবকান্ত এবার এফ, এ পরীক্ষা দিয়াছে। আশপাশের গ্রামের আরও কয়েকটি ছাত্রের এখনও কলেজ বন্ধ হয় নাই, তাই তাহাদের অনুরোধে, ভবকান্ত এ কয়টা দিন মেসের বাসায় রহিয়া গিয়াছে।

ভবকান্তের এখনও বিবাহ হয় নাই, তাই দেশে ফিরিবার দিকে তাহার চাড়ও ততটা ছিল না! এবং কলেজ-যাওয়া, পড়াশুনা প্রভৃতির মধ্যে ব্যস্ত থাকার দরুণ, কলিকাতা সহরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়-স্থাপনে, যে সুবিধা এতদিন ঘটিয়া উঠে নাই, এখন তাহার সুব্যবস্থা করিবে বলিয়া সে সঙ্কল্প করিল।

সকালে পরেশনাথের বাগান, দুপুরে কোনদিন চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, খিদিরপুরের ডক, কোনদিন বা শিবপুর, মনুমেণ্ট, হাইকোর্ট, সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন, রাত্রে থিয়েটার—ভবকান্তকে কলিকাতায় ধরিয়া রাখিবার পক্ষে, ইহারই ত পর্য্যাপ্ত! তাহার উপর আবার ছিল, "সংহন্ত্রী" সাপ্তাহিক পত্রিকার পুস্তকবিভাগ হইতে প্রকাশিত, এক টাকায় পঞ্চান্নখানি উপন্যাস! এমন

বিস্তীর্ণ আয়োজন ফেলিয়া, এই অসহ্য গ্রীষ্মে পাড়াগাঁয়, জঙ্গল-পরিবেষ্টিত পানাপুকুরের পাড়ে অবস্থিত জীর্ণ বাটীর মধ্যে যে আশ্রয় গ্রহণ করে, সে নিতান্তই হতভাগ্য !

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। মেসের ছাদে, ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া ভবকান্ত একাগ্র চিত্তে "পিশাচিনী পারুলকামিনী" পড়িতেছিল। ঘন জঙ্গলে, দস্যু-পরিবৃত ইন্দ্রধ্বজ সিংহের উদ্ধারে ছদ্মবেশিনী, রাজকন্যা অনঙ্গমঞ্জরী একাকিনী আসিয়া, তরবারি-চালনায়, পঞ্চাশজন ভীমবল দস্যুকে চকিতে নিহত করেন, তাহারই লোমহর্ষণ বিবরণী পড়িতে পড়িতে তাহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল! তার পর যখন অনঙ্গমঞ্জরী ও ইন্দ্রধ্বজ সিংহ উভয়েই জানিতে পারিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে কত কাল হইতে কি অসহ্যভাবেই ভালবাসিয়া আসিতেছেন, তখন বেচারা ভবকান্তের হৃদয়তন্ত্রীতে একটা কোমল সুর বাজিয়া উঠিল। আর, ঠিক এই সময় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিধার ছাইয়া ফেলিল। বইয়ের অক্ষর ভাল লক্ষ্য হইল না। ভবকান্ত বহি বন্ধ করিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

সম্মুখে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে শানাই বাজিতেছিল। একে বসন্ত কাল, মৃদু স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে, তায় সদ্য উপন্যাস-উদ্‌ভ্রান্ত তরুণ পাঠকের উন্মুখ হৃদয়, তাহার উপর শানাইয়ের মিষ্ট রাগিণী! ভবকান্ত অধীর চিত্তে আসিয়া ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইল।

মরীচিকা

বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর ছাদে, সবুজ, বসন্তী প্রভৃতি নানা রঙের কাপড়-পরা ফুটফুটে মেয়েগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। ভবকান্ত উদাস দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, জগতে সুখ যদি কোথাও থাকে ত, ঐ বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর ছাদেই তাহা আছে! আর এই বীরেন্দ্রবাবুর সহিত যাহাদিগের সম্পর্ক আছে, এ জগতে তাহাদেরই জীবনধারণ শুধু সার্থক! এই ছোট মেয়েগুলি অসঙ্কোচে যাহাদের সহিত আলাপ-পরিহাস করে, যাহাদিগকে দেখিলে আনন্দে-অভিমানে মাতিয়া উঠে, ধন্য, শুধু তাহারাই! হায়, সে তাহাদিগের কেহই নহে! তাহার অসুখ হইলে বীরেন্দ্রবাবুর বাটীর দাসদাসীরাও তাহার সন্ধান লইবে না, তাহার সুখে বীরেন্দ্র বাবুর দ্বারবান অবধি এতটুকু আনন্দ জানাইতে আসিবে না, ছেলেমেয়েগুলি ত নহেই! সে যদি আজ মুলিগাঁয়ের ভবকান্ত না হইয়া, বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ীর এই ছেলেমেয়েদের গাড়ী টানিবার ভৃত্য হইত, তাহা হইলেও আজ তাহার কত সুখ ছিল! ভবকান্ত ধীরে ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনেক কথাই ভাবিয়া ফেলিল। এই হাস্যময়ী, সজ্জিতা, সুবেশা, চম্পকবরণী ছোট মেয়েগুলির পাশে দাঁড়াইতে পারে, সমগ্র মুলিগাঁ খুঁজিলে, এমন একটী মেয়েও মিলে কি না সন্দেহ! নুরজাহান, বুঝি, শৈশবে ঠিক এমনই ছিল! ইহার মধ্যে, যদি কেহ বেচারা ভবকান্তের হৃদয়ভাগিনী হয়—! বাতাসে, ভবকান্তের দীর্ঘনিশ্বাস ভাসিয়া গেল!

সে রাত্রে বিছানায় শয়ন করিয়া, একটা কথা কেবলই ভবকান্তের মনে হইতেছিল—এত বয়স হইতে চলিল, তবু ত সে কাহারও প্রেমে পড়ে নাই! তাহার অদৃষ্ট নিতান্তই অপ্রসন্ন! বন্ধু যোগেশ্বর প্রেমে পড়িয়াছিল, সত্যরও দুইবার লভ্ হইয়াছিল, আর সে এমন কি দোষ করিয়াছে যে, প্রেমের নিরাশ যাতনাটুকু ভোগ করিবার অবকাশও তাহাকে দাও নাই, ভগবান!

আজ সে ভাবিতেছিল, প্রেমে পড়িবার পক্ষে যোগ্যা পাত্রীই বা তাহার মিলে কোথায়! এই বীরেন্দ্র বাবুর বাড়ী—আহা, তাহা যদি সম্ভব হইত! তাহা হইলে, জগতে তাহার আর কোন অভাবই থাকিত না! ভবকান্ত না হইয়া, সে যদি আজ কোন উপন্যাসের নায়ক হইত, তাহা হইলে কি সুখই না হইত। দস্যু-হস্তে নিগৃহীত হইতে কি সে পশ্চাৎপদ, যদি অনঙ্গমঞ্জরীর মত, তাহার উদ্ধার-কর্ত্রী মিলিবার সম্ভাবনা থাকে!

শেষ রাত্রে, ঘুম ভাঙ্গিলে, ভবকান্ত স্থির করিল, কলিকাতায় কাহারও সহিত তাহার তেমন আলাপ নাই, দেশে ফিরিয়া প্রেমে পড়িবার জন্য সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুরোদ্গম।

নুলিগাঁয়ের বাটির বাহিরের রোয়াকে ভবকান্ত বসিয়াছিল। সম্মুখের বাগানে, পাড়ার বালিকারা ফুল তুলিতেছিল। ইহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা শৈবলিনী দেখিতে-শুনিতে মন্দ নহে! নামটিও শৈবলিনী! প্রেমের পক্ষে উপযুক্তা পাত্রী বটে! তবে তাহার শাণিত রসনা দেশে এমন প্রসিদ্ধি বিস্তার করিয়াছিল যে, ভবিষ্যতে সে কলহ-বিদ্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে বলিয়া সকলের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। আর শুধুই কি রসনা! কিল-চড় প্রভৃতি প্রহারবর্ষণেও সে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিত। এক কথায়, ছোট গ্রামখানিতে; সে বর্গীর হাঙ্গামার তুল্যই ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। পাড়ার ছেলেমেয়েরা তাহাকে সম্রাজ্ঞীর আসনে বরণ করিয়া সশঙ্কচিত্তে তাহার আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিত। তাহার খর বচনের আশঙ্কায়, কলিকাতা-প্রত্যাগত ভবকান্ত একদিনও প্রেমাভিব্যক্তির সাহস পায় নাই। আজ তাহাকে দেখিয়া, ক্ষোভে, বেচারার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল! হায়, প্রতাপ! হায়, শৈবলিনী, শৈ—!

সহসা ভবকান্তের চোখের সম্মুখে একটা ছোট খাট যুদ্ধ হইয়া গেল। বুড়ী, ওরফে সুরমার বয়স আট বৎসর। বেশ শান্ত, ধীর মেয়েটি। সে বেচারা তাহার মামার বাড়ীতেই প্রায় থাকিত, কাজেই, শৈবলিনীকে তেমন চিনিত না! আজ ফুল

তুলিতে আসিয়া সে মালীর নিকট হইতে ভাল দুইটি চাঁপাফুল সংগ্রহ করিয়াছিল। শৈবলিনী দেখিতে পাইয়া তাহাতে সম্রাজ্ঞীর ন্যায্য দাবী বসাইলে সুরমা তাহা ছাড়িল না। প্রতিপত্তি-রক্ষার জন্য, অগত্যা, শৈবলিনী সুরমার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত বর্ষণ করিয়া, তাহার সাজির ফুলগুলি রাজকোষে বাজেয়াপ্ত করিয়া, স্থান ত্যাগ করিল। অনুগত অক্ষৌহিণীর মত, মেয়ের দল, "মাগো, কি একগুঁয়ে মেয়ে" বলিয়া সগৌরবে শৈবলিনীর অনুসরণ করিল। সুরমা মাটিতে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বেচারীর ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

ভবকান্ত তাড়াতাড়ি সুরমাকে তুলিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া আসিল। লজেঞ্জেস ও চুরোটের ছবি দিয়া, ডিক্সনারীর ছবি, দেখাইয়া, নানা উপায়ে, সে সুরমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিল।

ইহার পর হইতে, সুরমা ও ভবকান্তকে প্রায় একত্র বেড়াইতে দেখা যাইত। ভবকান্ত ছবি দেখাইয়া, গল্প বলিয়া, অনভিজ্ঞা সরলা বালিকাটির হৃদয়-হরণে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিল। উপন্যাসের নায়কের মত, সে সুরমার জন্য গাছ হইতে ফুল-ফল পাড়িয়া দিত, সন্ধ্যার সময় রোয়াকে বসিয়া আকাশের তারাও গণিত। এই সময় আবার লুকাইয়া ভবকান্ত কবিতা লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিল, বাড়ীর লোকে অবশ্য তাহা জানিতে পারে নাই। এক একবার সে ভাবিত, সুরমা নিতান্ত বালিকা, আবার মনে হইত, প্রতাপ ও শৈবলিনী, যথন আম্রকাননে খেলা করিত, তথন তাহাদিগেরও এমন কি বয়স হইয়াছিল!

সেদিন দুপুরবেলা ভবকান্ত কাগজের নৌকা তৈয়ার করিতেছিল। সুরমা নিকটে বসিয়াছিল। ভবকান্ত ডাকিল, "সুর।"

"কেন, ভবদা ?"

"তুমি আমাকে ভালবাস ?"

"বাসি।"

"খুব, ভালবাস ?"

"খুব !"

তারপর ভবকান্ত আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা বাধিয়া গেল ! লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। ভবকান্ত আবার ডাকিল, "সুর !"

"কেন ?"

"তুমি সাঁতার কাটতে জান ?" কিছুদিন পূর্ব্বে, সে 'চন্দ্রশেখর' পড়িয়াছিল। তাই, বোধ হয় সাঁতারের কথা তাহার মনে পড়িতেছিল !

সুরমা কহিল, "না !"

"সাঁতারটা শিখো—শেখা ভাল !"

"মা যে বকে, ভবদা, পুকুরে নাইতে গেলে—"

"বটে !"

ভবকান্ত কহিল, "সুর, তুমি—" কথাটা শেষ হইল না। কে যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। চাপা গলায় আবার সে ডাকিল, "সুর !"

"না, ভবদা, অমন করে কথা কয়ো না ভাই, আমার বড় ভয় পায়, জান ত, ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা!"

কিন্তু ভবকান্ত আজ মরিয়া হইয়াছিল। আজ সে হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া জানাইতে চাহে, সুরমাকে সে কত ভালবাসে! তাহার জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় ত, তাহাতেও সে আজ প্রস্তত। মিথ্যা লজ্জা করিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ হারাইবে, এত বড় মূর্খ ও কাপুরুষ, সে কখনও নয়!

ভবকান্ত কহিল, "সুর, আমাকে বিয়ে করবে?"

"যাঃ—"

"না, সুর, বল। বল, বিয়ে করবে—তা হলে, আমি তোমাকে অনেক ছবি দেব—কলকেতা থেকে আসবার সময় কত নূতন পুতুল, রঙীন জলছবি কিনে আনব—কত জিনিষ দেব, বল, লজ্জা কি? বল, আমাকে তুমি বিয়ে করবে?"

মৃদু হাসিয়া সুরমা কহিল, "ওমা, দাদার সঙ্গে বুঝি আবার বিয়ে হয়!"

ভবকান্ত ভাবিল, নিরাশ হইলে চলিবে না। সে কহিল, "এস সুর—এখন সকলে ঘুমোচ্ছে, তোমাকে পুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে দিইগে!"

"আর, তোমার কাপড় ভিজুলে বকুনি খাবে যে!"

"আমি আলাদা কাপড় নিয়ে যাব—কেউ জানতে পারবে কেন?"

"না, ভাই, আমি যাব না! মা জানতে পারলে বকবে!"

"কেউ জানবে না—এস না, তুমি পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখবে, আমি কেমন ডুব সাঁতার দি!"

"আমার, ভাই, ডুব সাঁতার কাটা দেখতে বড় ভাল লাগে।"

উভয়ে দীঘির ধারে গেল! ভবকান্ত জলে সাঁতার কাটিতে নামিল। সুরমা উপরে দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় তীব্রকণ্ঠে সুরমার পিসিমার চীৎকার-ধ্বনি শুনা গেল! পিসিমা বলিলেন, "পোড়ারমুখো মেয়ে, এখানে ছুটে বেড়াচ্ছ! হাবলীদের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে, না? সকলে খুঁজে খুঁজে সারা—মেয়ে এখানে পুকুর ধারে রোদ পোহাচ্ছেন! পুরুষ মানুষের সঙ্গে বেড়ানো কি, লা? বাড়ী যা! চুল বাঁধতে হবে না?"

সুরমা কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "এ্যাঁ, ভবদা যে বললে, পদ্মফুল তুলে দেবে।"

পিসিমা কহিলেন, "ভব, বাবা, পদ্মফুল নিয়ে খেলা করে না, ছিঃ! তুলে আমাকে দিয়ে এস, কাল পূজো করে বাঁচবো,—কেমন, বাবা?"

"বেশ ত, পিসিমা।"

পিসিমা সুরমাকে লইয়া রঙ্গস্থল ত্যাগ করিলে, ভবকান্ত ক্লিষ্ট-চিত্তে গৃহে ফিরিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিণতি।

সেদিন সুরমা আসিয়া যখন ভবকান্তকে ডাকিল, তখন ভবকান্ত সবেমাত্র "ঝঞ্ঝাময়ী" উপন্যাস শেষ করিয়াছে। বাঙ্গালা উপন্যাস সবগুলিই প্রায় ভবকান্ত পড়িয়া ফেলিয়াছে। তবে ঝঞ্ঝা-ময়ীর মত মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় আর আছে কিনা, সন্দেহ! ৭৭২ খানি পৃষ্ঠা। তাহার পাত্রপাত্রীগুলা ভবকান্তকে বিচিত্র স্বপ্নমোহে বিভোর করিয়াছিল! সুরমাকে দেখিয়া ভবকান্ত কহিল, "সুর, হালদার্নীর বাগানে আজ যদি সন্ধ্যার সময় যাও ত, তোমায় কাঁচামিঠা আঁব পেড়ে দিই।"

কাঁচামিঠা আম্রের প্রতি সুরমার বিশেষ লোভ থাকিলেও, সন্ধ্যাবেলায় গাছপালার নিকট যাইতে তাহার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

ভবকান্ত কহিল, "যাবে না, সুর?"

কাঁচামিঠা আম্রের লোভ ছাড়াও সহজ নহে। শেষ মুহূর্ত্ত অবধি চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি! সুরমা কহিল, "যাব।"

"বেশ, মনে থাকে যেন! পুকুরের সিঁড়ির উপর আমি থাকব —তোমার কোন ভয় নেই! উঃ, কি বড় বড় আঁবই হয়েছে!"

"এখনই, কেন, আনবে চল না, ভবদা?"

"এখন ওখানে লোক আছে। তারা গাছ জমা নিয়েছে। পাড়তে দেবে কেন?"

"তা বটে!" সুরমার জিভে জল আসিয়াছিল। সেই বড় বড় কাঁচামিঠা আঁবগুলি—আহা, এমন ভাল জিনিষ কি আর আছে! ভবদা তাহাকে বড় ভালবাসে, সত্য। বড় লক্ষ্মী ছেলে, ভবদা! সে যে আঁব খাইতে ভালবাসে, ভবদা কেমন করিয়া তাহা জানিল!

"তা হলে মনে থাকে যেন, সুর—নিশ্চয় এস—আর কেউ যেন না জানতে পারে, দেখো।"

কাঁচামিঠা আম্রের প্রতি ভবকান্তের যে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল, তাহা নহে! তুচ্ছ দুইটা ফলের জন্য উদ্গ্রীব হইবে, সে-কাল আর তাহার নাই! প্রেমের মহিমায় সে আজ সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। আপনার স্বার্থ বলি দিতে আজ সে এতটুকু কাতর নয়! সুরমার জন্য দুইটা আঁব পাড়িয়া দেওয়া—সে ত সামান্য ব্যাপার! তাহার জন্য, আজ সে প্রাণ দিতে পারে! কিন্তু সুরমা কি তাহার গভীর হৃদয়ের অগাধ অসীম ভালবাসার প্রতিদান দিবে! নাই দিক্—তবু ভালবাসিয়াই ভবকান্তের সুখ! আহা, পরীক্ষার অন্তরালে, তাহার জন্য, এমন স্বর্গের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল, সে-ত স্বপ্নেও কখন তাহা ভাবে নাই!

কিন্তু আম্রচুরি ব্যাপারটা একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল না। সুরমা নারী—হউক বালিকা—তাহার সহিত আজ সে একটু ছলনা করিয়াছে! রণে প্রেমে সে ছলনাটুকু অবশ্য ক্ষমার্হ। সাহিত্যে এমন বিস্তর নজীর আছে!

আম্রের লোভ দেখাইয়া সুরমাকে সে বাগানে লইয়া যাইতে চাহে। উপন্যাসে সে পড়িয়াছিল, সরোবরের মর্ম্মর সোপানে

বসিয়া প্রেমিক-প্রেমিকারা হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করে। চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশীথ, মাথার উপর তারকাখচিত, অনন্ত নীল আকাশ, পদতলে সরোবরের কালো জল! আহা, প্রেমাভিব্যক্তির পক্ষে সেই ত উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত স্থান। সুরমা নিতান্ত বালিকা—পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা বালিকামাত্র—নহিলে, তাহার জন্য সুরমা একছড়া মালাও কোনদিন গাঁথিয়া দেয় নাই। যাই হউক, আজ সে নিজে চুপি চুপি বেল ও বকুল ফুল দিয়া দুই ছড়া মালা গাঁথিয়াছে। পাছে শুখাইয়া যায়, এই ভয়ে, ডেস্কের মধ্যে এক বাটি জলে সে দুইটি ভিজাইয়া রাখিয়াছে। সেই মালার একগাছি সে আজ সুরমার কণ্ঠে পরাইয়া দিবে—আর অপর গাছি সুরমা তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিবে। নিকটেও পুষ্করিণী ছিল, গ্রামের নরনারী সন্ধ্যার সময় সেখানে বিরল হইলেও সে সকল পুষ্করিণীতে তালগাছের মূলই সোপানের স্থান অধিকার করিয়াছিল—নায়ক-নায়িকার বসিবার মত উপযুক্ত স্থান ছিল না!

হালদার্ণীর বাগান লোকালয়ের একটু দূরে! পুষ্করিণীর সোপান মর্ম্মর-রচিত না হইলেও, তথায় জীর্ণ ইষ্টক খণ্ডে বসিবার স্থান সংগ্রহ করিয়া লওয়া যাইত।

সন্ধ্যার পর, কাগজের মধ্যে, মালা দুইটি জড়াইয়া, ভবকান্ত হালদার্ণীর বাগানে উপস্থিত হইল। সোপানের জীর্ণ ইষ্টকস্তূপে বসিয়া অধীর আবেগে সে নায়িকার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া নামিল। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। স্তব্ধ বিজনতায়, ঝিল্লীর গভীর ধ্বনিতে

ভবকান্তের প্রাণটা শিহরিয়া উঠিতেছিল। আকাশে চাঁদ ছিল না! আজ যে কৃষ্ণ পক্ষের ত্রয়োদশী, অতিরিক্ত অধীরতায়, সেদিকে লক্ষ্য করিবার, ভবকান্তের অবসরই মিলে নাই। চাঁদ উঠিবে না জানিলে, সে কখনই এ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইত না! কাঁচা-মিঠা আম্র পাড়িবার তাহার এতটুকু ইচ্ছা বা সাহস ছিল না—কেমন করিয়া এই আম-কাঁঠালের ঝোপ পার হইয়া, চাঁপাগাছের তলা ঘুরিয়া, বাগান ছাড়িয়া গৃহে যাইবে, ইহা ভাবিয়াই সে আকুল হইয়া উঠিল।

পুষ্করিণীর অপর পারে, গাছের ঝোপে জোনাকি জ্বলিতেছিল, ভবকান্তের মনে হইল, ওগুলা ভূতের চোখ জ্বলিতেছে! তালগাছের পাতাগুলার মধ্যে বায়ু সোঁ সোঁ শব্দে গর্জ্জিতেছিল, ভবকান্ত ভাবিল, এ ভূতেরই নিশ্বাসের শব্দ! কি বিড়ম্বনা! তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল! আর, মনে হইতেছিল কি পাপীয়সী, বিশ্বাসঘাতিনী, এই সুরমা! অধীর প্রতীক্ষায়, এই অন্ধকারে, বাগানের মধ্যে ভূতপ্রেতের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া সে বসিয়া—ভয়ে তাহার বুক দুর দুর করিতেছে; জিহ্বা শুখাইয়া আসিয়াছে—আর, সেই পিশাচিনী সুরমা নিশ্চিন্ত চিত্তে হয়ত তাহার পিসিমার কাছে আবদার ধরিয়া গল্প শুনিতেছে! সে যদি কোন রাজপুত্র হইত ত, এখনই ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে উপস্থিত হইত, এবং তরবারির আঘাতে তাহার এ গভীর পাপে চূড়ান্ত শাস্তির বিধান করিত! কিন্তু হায়, সে রাজপুত্র নহে, তাহার ঘোড়া নাই, তরবারি নাই, অধিকন্তু সদ্য পরীক্ষার

ফল বাহির হইবার আশঙ্কায় সে নিতান্ত নিরীহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর, জবরদস্ত প্রেমের এই বিকট অত্যাচার! সে কাঁদিয়া ফেলিল! এ বিশ্বাস-ভঙ্গের কি শাস্তি নাই?

সহসা পত্রমর্ম্মর শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল! তাহার গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল! কে আসে না! সুরমা কি? আহা, সুরমা তবে সত্যই তাহাকে ভালবাসে! কিন্তু এ'ত সুরমার পায়ের শব্দ নয়! এ যে ক্ষিপ্রগতিতে কে ছুটিয়া আসে! ভবকান্ত ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শৈশবে সে শুনিয়াছিল, হালদার্ণীর বাগানে, রাত্রে ভূতের লড়াই হয়! সে ভাবিল, হায়, প্রেমের জন্য ভূতের হাতে অবশেষে প্রাণটা দিতে হইল! তবু একবার শেষ চেষ্টা—সে যে ভয় পাইয়াছে, ভূতকে সে কথা জানান হইবে না! মুখে সাহস দেখাইতে হইবে। অমন করিয়া কত লোক ভূতের হাতে বাঁচিয়া গিয়াছে! কিন্তু আর ভাবিবার অবসর নাই! ভূত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!

সে সাহসে ভর করিয়া সিঁড়ির রোয়াকে উঠিল! ভূত যে তাহারই পাশে আসিয়া পড়িয়াছে! সর্ব্বনাশ! সে প্রাণপণে শক্তিসঞ্চয় করিয়া কহিল, "কে?" কথাটা কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল! দূরে প্রতিধ্বনি উঠিল, "কে!"

এমন সময় সম্মুখেই নিশ্বাসের শব্দ, 'ফোঁস!' ভবকান্ত টাল সামলাইতে না পারিয়া, 'মাগো' বলিয়া, উলটিয়া পাঁকের মধ্যে পড়িয়া গেল!

* * * *

উড়িয়া মালী ভিজা কাপড় পরা, কাদা মাখা ভবকান্তকে তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া সংবাদ দিল, বাবু বাগানে আঁব চুরি করিতে গিয়াছিল। তাহার গরুটা দড়ি ছিঁড়িয়া সেদিকে আসে। বাবু ভয় পাইয়া গাছ হইতে বুঝি পাঁকে পড়িয়াছিল। ছোকরা বাবুদিগের জ্বালায় সে মুনিবের কাছে প্রহার খাইয়া মরে! আর বাবুরা দুইটা আম্র চুরি করিবার লোভ ছাড়িতে পারে না!

সে দিন অপরাহ্ণে ভবকান্তের অজ্ঞাতে, তাহার পরীক্ষায় ফেল হওয়ার সংবাদ আসিয়া সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার উপর, আবার, লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা সন্ধ্যাবেলায়, ছোটলোকের মত, আম চুরি করিতে গিয়াছিল শুনিয়া, ভবকান্তের পিতা সমস্ত বিরক্তি ও অপমানের জ্বালা পুত্রের পৃষ্ঠে বর্ষণ করিলেন।

পরদিন হইতে ভবকান্ত সুরমাকে নিকটে ঘেঁসিতে দেয় নাই। নারীজাতির উপর তাহার আন্তরিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল।* নারীর প্রেমটা যে কিছুই নহে, তাহা যে বিরাট স্বার্থসংশ্লিষ্ট, ইহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল। ইহার পর হইতে সে আরও বুঝিয়াছিল, প্রেমটা জগতে দুষ্প্রাপ্য মরীচিকা মাত্র, আর বাঙ্গালা উপন্যাসগুলা নিতান্তই গাঁজাখুরি! ভবকান্ত আজ পর্য্যন্ত যে সে প্রতিজ্ঞা, ভীষ্মের মত অবিচলিতভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা আমরা হলফ্ করিয়া বলিতে পারি।

---

* সহৃদয় পাঠিকা ক্ষমা করিবেন,—ইহা ভবকান্তের মত, লেখকের নহে।

লেখক।

সুচরিত্র।

১

তখন সবেমাত্র প্রোবেসনারি-ডিম্বত্ব ভেদ করিয়া, সদ্য ডেপুটি ফুটিয়া বাগান্দায় বদলি হইয়াছি।

সেদিন কাছারি হইতে ফিরিতেই রীতিমত বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আলো জ্বালাইয়া ইজি-চেয়ারে পড়িয়া উপন্যাসের মধ্যে মগ্ন হইবার চেষ্টা দেখিতেছিলাম। কিছু ভাল লাগিতেছিল না। একে, আজন্ম কলিকাতায় বাস, তায় এই সঙ্গীহীন বিজন পল্লী, আবার তাহার উপর ঘনীভূত বর্ষা! 'প্রত্যাসন্নে নভসি' মেঘদূতের যক্ষের মত, আমার চিত্ত প্রিয়ার জন্য বেশী করিয়াই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তখন আমার সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। বিবাহিত জীবনে এই প্রথম বর্ষা। রবিবাবুর কাব্যরসগ্রাহী আমার মনের অবস্থা সুতরাং সহজেই অনুমেয়।

সহসা বাহিরে একটা কোলাহল শুনিয়া উঠিয়া আসিলাম। দেখি, আমার চাপরাসিপুঙ্গব উপস্থিত কার্য্য হাতে না থাকায় এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর সহিত গোলমাল বাধাইয়া দিয়াছে। বৃদ্ধাটি খঞ্জ! তাহার অপরাধ, সে এই বৃষ্টিতে, ভিজা-কাপড়ে, এক পা কাদা শুদ্ধ 'ডিবটি-সাবে'র গাড়ীবারাণ্ডায় আসিয়া অসম্ভব দুঃসাহস ও আস্পর্দ্ধার পরিচয় দিয়াছে, এবং পুনঃ পুনঃ বলা-কহা সত্ত্বেও এ

স্থান ত্যাগ করিতেছে না! ‘প্রখর রবির তাপ’ ও ‘রবিতপ্ত বালুকার’ কথা আমার চট্‌ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। চাপরাশিকে ভৎ র্সনা করিয়া বৃদ্ধাকে কহিলাম, “ওখানে বৃষ্টির ঝাট আস্‌ছে, তুমি উঠে এই বারাণ্ডায় বস। বৃষ্টি থামলে যেয়ো!”

বৃদ্ধা গদ্গদকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিল, “বেঁচে থাক বাবা! বুড়ো মানুষ—তায় কদিন ধরে জ্বর হচ্ছে! এই বৃষ্টিতে বড় কাঁপিয়ে দিলে। কাছে কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা নাই বলে, এখানে এসে বসেছি, বাবা!”

একটা করুণ সহানুভূতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ডেপুটিগিরিতে তখনও পাকা হই নাই, পুঁথির কথাগুলা, সুতরাং, একেবারে ভুলি নাই। আমি কহিলাম, “জ্বর! তাহলে এই বর্ষায় বেরিয়ে ভাল করনি, বাপু, আমি একখানা কম্বল দিচ্ছি—সেইটে মুড়ি দিয়ে এইখানেই আজ পড়ে থাক। কাল সকালে বাড়ী যেয়ো!”

বৃদ্ধার চোখে, বোধ হয়, জল আসিয়াছিল। রুদ্ধস্বরে সে কহিল, “গরিবের প্রতি তোমার এত দয়া! ভগবান তোমার ভাল করবেন, বাবা। চিরদিন আমার এমন দুঃখ-দুর্দ্দিশা ছিল না।”

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য! কারণ তাহার কণ্ঠস্বর সাধারণ ভিখারিণীর মত নহে! বৃদ্ধাকে একখানি কম্বল ও শুষ্ক বস্ত্র আনাইয়া দিলাম।

ভোজন-শেষে, আবার বারাণ্ডায় আসিলাম। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি কহিলাম, “একটু দুধ খাবে?”

বৃদ্ধা কোন উত্তর দিল না। বেহারাকে দুধ আনিতে বলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাড়ী কি, এ দেশেই ?"

"হাঁ, বাবা !"

তাহার পর পরিচয়ে জানিলাম, সে ব্রাহ্মণকন্যা। তাহার পিতা গ্রামের পৌরোহিত্য করিয়া বেশ সুখস্বচ্ছন্দেই দিন কাটাইয়া গিয়াছে। বাল্যে মাতৃহীনা হইলেও, পিতার স্নেহে, সে অভাব তাহাকে একদিনের জন্য অনুভব করিতে হয় নাই। পিতারও বহুদিন মৃত্যু হইয়াছে। এখন সংসারে 'আপনার' বলিতে তাহার আর কেহ নাই। বৃদ্ধ ডাক্তার বামাচরণবাবু তাহাকে মাসে দুইটি করিয়া টাকা দেন, আর সে নিজের হাতে পৈতা তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে! এখন যে এই দুরবস্থা, এ তাহারই গভীর পাপের শাস্তি! বৃদ্ধা কহিল, "আমার মা, বুঝি, এখানে নাই, বাবা ?"

তখন নোলক-পরা, হাসি-ভরা, কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ-ঝরা সুন্দর একটি ছোট মুখের কথা চকিতে আমার মনে পড়িয়া গেল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম, "না, এদেশে আমি এই নূতন এসেছি! তারা আর মাসখানেক পরে সব এখানে আসবে।"

২

সকালেও অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বিরাম নাই। অস্থির করিয়া তুলিল। একে বিদেশ, কাছে এমন একটি লোক নাই, যাহার সহিত দুই দণ্ড কথা কহিয়া বাঁচি। তাহার উপর প্রকৃতির

এই নিরানন্দ ভাব। প্রাণের মধ্যে বিচ্ছেদের ঘন অন্ধকার, বাহিরের আলোকও রুদ্ধ। বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি! প্রাণ যেন বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছে!

বারাণ্ডায় আসিয়া দেখি, বুড়ী কম্বল মুড়ি দিয়া নিদ্রা যাইতেছে। রোগের চিহ্ন থাকিলেও তাহার মুখ হইতে লাবণ্যের শেষ রেখাটুকু এখনও ঝরিয়া যায় নাই! মেঘের আড়াল হইতে সূর্য্যের দুই একটা ক্ষীণরশ্মি ফুটিয়া উঠিলে আকাশে যেমন একটি বিচিত্র বর্ণের আভাস পাওয়া যায়, অনেকটা যেন, তেমনই!

চাপরাশি সকালের 'ডাক' লইয়া আসিলে, আমি বামাচরণ ডাক্তারের সন্ধান লইলাম। বামাচরণবাবু এখানকার প্রবীণ ডাক্তার; হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন; গরিবের, নাকি, তিনি মা-বাপ!

আমি একটা চিঠি লিখিয়া চাপরাশিকে বামাচরণবাবুর উদ্দেশ্যে পাঠাইলাম।

৩

তিন চারিদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া একদিন শেষ রাত্রে বৃদ্ধা নীরবে আমারই গৃহে দেহত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যুতে প্রাণে একটা আঘাত লাগিল। আহা, অনাথা নারী!

জানালার ধারে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলাম। বেহারা আসিয়া চা রাখিয়া গেল। আমি দেখিলাম। পানে রুচি বা প্রবৃত্তি ছিল না। আমার মনে হইতেছিল, জগতের

দারিদ্র্যের কথা। এমনই আহার-অভাবে, কত দরিদ্র রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ক্ষুধায় অন্ন নাই, রোগে ঔষধ নাই, তৃষ্ণায় জল নাই। কে তাহাদের সন্ধান লয়! কে তাহাদের দেখে! বিলাসী বাবুর হাভানা চুরুটের সহিত কত পয়সা 'ছাই' হইয়া যাইতেছে, তার ইহাদিগের একমুষ্টি অন্নসংগ্রহ করিবারও সামর্থ্য নাই, সঙ্গতি নাই।

বামাচরণবাবু কহিলেন, "আহা, বেচারী এ জীবনে কম কষ্টটা সহ্য করিয়াছে!" বৃদ্ধা সম্বন্ধে বামাচরণবাবু অনেক কথাই বলিলেন। আকৃতিতে বার্দ্ধক্য ঘনীভূত হইলেও, তারার বয়স চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে নাই। নানা দুঃখে-কষ্টে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আরও বিশেষ করিয়া তিনি বলিলেন, এই দরিদ্রা, উপেক্ষিতা নারীর হৃদয়-সম্পদের বিশালতার কথা!

তারার পিতা মধু ভট্টাচার্য্য ছিলেন, গ্রামের পুরোহিত। তারার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন অশীতিবর্ষ কোন কুলীন চূড়ামণির হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া মধু ভট্টাচার্য্য আপনার স্বর্গের পথ সুপ্রশস্ত করেন। বিবাহের সময় নানাবিধ জটিল ব্যাধিতে পাত্রের জীবনী-শক্তি একেবারে হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। বিবাহের ঠিক তিন দিন পরেই তারা বিধবা হয়।

বালিকাবয়স হইতেই, বৈধব্য-ব্রতে পালিতা ব্রাহ্মণ-কন্যা তারার নিষ্ঠার সীমা ছিল না।

তারার বয়স, তখন, সতেরো বৎসর। তাহার দুর্ভাগ্যের কথা

শুনিয়া আমি কহিলাম, "ও কি?" নীরেন্দ্র নিকটে আসিল। আমি বারাণ্ডায় গেলাম! দিব্য জ্যোৎস্না রাত্রি! স্পষ্ট, সেই চন্দ্রালোকে আমি দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক পথের একধারে পড়িয়া—এ কাতর স্বর, তাহারই! তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া যাইব, এমন সময় নীরেন্দ্র আমার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল, কহিল, "ডাক্তারবাবু, এ কথা কাকেও বলবেন না। আমার কোন দোষ নাই। দুজনেই আমরা নিষ্কলঙ্ক!" নীরেন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, কহিলাম, "ব্যাপার কি নীরু?"

নীরেন্দ্র কহিল, "আগে, নীচে চলুন, তারপর সব বলব! কিন্তু দেখবেন, কেউ যেন না জানতে পারে!"

নামিয়া আসিলাম। দেখি, পথে পড়িয়া, তারা! তারার সংজ্ঞা ছিল না। অল্পে অল্পে জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, দুইজনে ধরিয়া তাহাকে লাইব্রেরী ঘরে আনিলাম। তারার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

সংজ্ঞা ফিরিলে, আমি ডাকিলাম, "তারা!"

তারা কাঁদিয়া ফেলিল, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই!"

নীরেন্দ্র কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর, তারা!"

কোনমতে তারাকে লইয়া অদূরে মধু ভট্টাচার্য্যের গৃহে ফিরিলাম! মধু ভট্টাচার্য্য জমিদার বাড়ী পূজা সারিয়া ভিন্ন গ্রামে বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন। ভগবান যেন সুযোগ ঘটাইয়া দিলেন। হতভাগিনী বিধবা—তাহার বিপদে সাহায্য করিতে কেহ নাই,

অথচ মাথায় বাজ ফেলিবার জন্য, লক্ষ লোক এখনই নিমেষে উদ্যত হইয়া উঠিবে!

তারা তখনও কাঁদিতেছিল। সে কহিল, "আপনি বিশ্বাস করবেন, কি? সব কথা আপনাকে বলছি, শুনুন!"

তারা কহিল, কয়দিন ধরিয়া তাহার প্রাণে একটা চঞ্চলতা আসিয়াছিল! কি যেন একটা অভাব তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল! পূজার্চ্চনা বা কাজকর্ম্ম, কিছুতে যেন সে শান্তি পাইতেছিল না! এই নীরেন্দ্র, যদি একবার তাহাকে একটু আদর করিয়া ডাকে, তাহার সহিত যদি দুইটা কথা কহে, তাহা হইলেই যেন, তাহার নারী-জীবন সার্থক হয়, এমনই একটা-কিছু তারার মনে হইতেছিল!

নীরেন্দ্রেরও দোষ ছিল। সে কেন তারাকে অদৃশ্য বন্ধনে এমন করিয়া বাঁধিতেছিল? সে বিধবা—তারার দিকে এমন করিয়া করুণভাবে চাহিবার অধিকারই বা তাহাকে কে দিয়াছিল?

আহারাদির পর, সে রাত্রে তারা বাবুদের নীচেকার দালানেই বসিয়াছিল—প্রতিবেশিনীদ্বয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা নীরেন্দ্র আসিয়া ডাকিল, "তারা!" পাছে প্রতিবেশিনীরা দেখিয়া কিছু মনে করে, এই ভয়ে ভালমন্দ কিছু না ভাবিয়া মন্ত্র-চালিতের মত একেবারে পাপিনী সে স্বচ্ছন্দে তাহার অনুসরণ করিল! আর, কি দুর্বৃত্ত আচরণ ও স্পর্দ্ধা, এই নীরেন্দ্রের!

বাড়ীতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শুধু সিঁড়ির পাশের

ঘরে চাকরটা দ্বার ভেজাইয়া, সুর করিয়া, রামায়ণ পড়িতেছিল। তারা নীরেন্দ্রের সহিত লাইব্রেরী কক্ষে আসিল।

নীরেন্দ্র ডাকিল, "তারা!" কত কোমল, মিষ্ট, সে আহ্বান! তবু যেন, তাহাতে কি এক বিকটতা!

তখন নিমেষে তারা বুঝিয়া ফেলিল, কি এ ব্যাপার! পূর্ণিমার অত আলো, তাহার চোখে কালো হইয়া গেল।, তাহার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন বিদ্যুতের একটা তীব্র শিখা বহিয়া গেল। তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমাকে যেতে দিন, নীরুবাবু! আপনি কি সাহসে, কেন, আমাকে এখানে ডেকে আনলেন?"

নীরেন্দ্র কহিল,—তাহার স্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল,—নীরেন্দ্র কহিল, "এখনই যেও—শুধু একটিবার বল, তরি, আমাকে ভাল-বাসবে?"

ভালবাসা! মূঢ়! পিশাচ! কি তাহার অর্থ! কি তাহার সার্থকতা! কি তাহার ফল!

তারা বলিল, "না! যেতে দিন, আমাকে!" সে স্বরে যেন বহ্নি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল! বাহিরে যাইবে, এমন সময় আমারই পদশব্দ শুনিয়া তারা হঠিয়া আসিল। নীরেন্দ্র কহিল, "দেখ দেখি, কি সর্ব্বনাশ! এখনই আমার সুনাম নষ্ট হবে—অকলঙ্ক চরিত্রে দাগ পড়বে। তোমারও তাই হবে! এখন, উপায়!"

উপায় নাই! কি হইবে! তারা মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা না করিয়া, পাশের বারাণ্ডা হইতে একেবারে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছে!

শেষ রাত্রে তারার সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখি, নীরেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছে! সে একেবারে আমার পায় ধরিয়া কহিল, "ডাক্তারবাবু, দেখবেন, যেন কেউ এ কথা না জানতে পারে! তা হলে, আর আমার মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। আর, সমাজে বেচারী তারারও লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না!"

হায়, স্বার্থপর, কাপুরুষ, এমনই ভাবে তুমি অসহায়া নারীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছিলে!

আমি কহিলাম, "কোন ভয় নাই, তোমার।"

নীরেন্দ্র চলিয়া গেল। মধু ভট্টাচার্য্য ফিরিলে, তাঁহাকে বুঝাইলাম, রাত্রে হঠাৎ রোয়াক হইতে পড়িয়া তারার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

ভাঙ্গা পা, এ জীবনে, আর তেমন করিয়া জোড়া লাগিল না।

এইটুকু ভিন্ন, তারার জীবনে এতটুকু গোপনতা, এতটুকু কলঙ্ক নাই। নিষ্ঠাবতী, করুণাময়ী নারী, সকলের সুখে-দুঃখে, আজীবন সহানুভূতি দেখাইয়া আসিয়াছে। আজ সে নাই, তাই কথাটুকু আপনাকে বলিলাম।"

আমি কহিলাম, "আর, নীরেন্দ্রের সংবাদ কি?"

"সে এখন কলিকাতায় থাকে! তাহার সুচরিত্রে অবশ্য কোন দাগ পড়ে নাই! এই ঘটনার কিছুদিন পরেই সে কলিকাতা চলিয়া যায়। খবরের কাগজে, তাহার নাম দেখেন না? সে যে এই

মর্লির রিফর্ম্মের পর, কাউন্সিলের মেম্বর হইবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে! এবং এ বিষয়ে সম্ভাবনাও নাকি তাহার বেশ আছে, শুনিতে পাই!"

দুর্ভাগ্য।

মক্কেলটির উপর মায়া পড়িয়াছিল। এত করিয়াও আইনের সমক্ষে তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিলাম না!

বি, এল পাশ করিয়া আদালতে যাওয়া আসাই করিতাম। এই আমার প্রথম মক্কেল। আইনের নজীর-পত্র ঘাঁটিতে এতটুকু ত্রুটি করি নাই! শুধু প্রথম মক্কেল বলিয়া নহে, লোকটির মুখে-চোখে কেমন যেন একটা করুণ বেদনা মাখানো ছিল, তাই আমার চিত্ত এতটা আর্দ্র হইয়াছিল।

চুরির অপরাধে, বিচারে তাহার পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে!

সে দিন রবিবার। জেলর বন্ধুর অনুমতি লইয়া জেলে তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বসিয়াছিল। তাহার মাথার চুলের উপর রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি ডাকিলাম, "গোষ্ঠ!"

আমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রণাম করিয়া কহিল, "রক্ষা হল না, বাবু, আমারই অদৃষ্ট!"

আমিও বুঝাইলাম, তাহার অদৃষ্টই বটে! নহিলে সে যে নির্দোষ, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। তবে, প্রমাণের অভাব।

গোষ্ঠ কহিল, "বাবু, একটা চিঠি যদি লিখিয়া দেন,—আমার বন্ধু নন্দ আমার সংসার দেখিবে। আমি বলিয়া দিতেছি।"

পকেটেই কাগজ পেন্সিল ছিল। বাহির করিলাম। গোষ্ঠ বলিতে লাগিল,—আমি লিখিলাম, "নন্দ, আমার কথা বোধ হয়, সবই শুনিয়াছ। পাঁচ বৎসর পরে কি আর বাঁচিয়া ফিরিব? খোকাকে দেখিও, আর রাধা—তাহাদের আর কেহ নাই।"

সে বলিল, "এই চিঠিখানা আমার বাড়ীতে কাহারও হাতদিয়া পাঠাইয়া দিলেই নন্দর হাতে পড়িবে। নন্দ আমার বড় ভালবাসে।" তার পর, গোষ্ঠ কহিল, "বাবু, সব কথা আপনাকে খুলিয়া বলি। সেই সব কথাই দিনরাত মনে পড়িতেছে।"

আমি কহিলাম, "বল।"

গোষ্ঠ বলিতে লাগিল, "চুরি করা কাজটা ভাল নয়। এ অভ্যাস ছাড়িব বলিয়া অনেকবার দিব্য গালিয়াছি, কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে, তাহার কিছুও যদি সে করিতে পারিত ত পৃথিবীতে এত দুঃখ-দুর্দ্দশা তাহাকে ভোগ করিতে হইত না। কেমন করিয়া সব ঘটিল, তাহাই বলিতেছি।

অল্প বয়সেই বাপ মা হারাইয়াছি। যত্ন করিবার কেহ ছিল না, কিন্তু শাসন করিবার জন্য পাড়ার লোকও কোমর বাঁধিত। এই সকল কারণে খুবই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলাম। লেখাপড়ায় মোটে মন লাগিত না। দল বাঁধিয়া ফলফুল চুরি করা, পাখীর ছানা পাড়া, নানা রকমে সকলকে বিব্রত করাই নৈমিত্তিক কার্য্য দাঁড়াইয়াছিল। এ সকল কাজে কেমন একটা আরামও পাইতাম।

রোগ ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতেছিল। পরের জিনিস নষ্ট করিবার জন্য, লইবার জন্য প্রাণটা যেন আকুল হইয়া উঠিত। আদালতে নাম লিখাইলাম, দুই একবার জেলখানাও দর্শন করিলাম। নাম ও সাহস বাড়িয়া গেল।

এমন করিয়াই দিন যাইতেছিল। কি করিতেছি, পরে কি হইবে, এ সকল ভাবিবারও অবসর ছিল না! শেষে একদিন বিবাহ হইয়া গেল। এমন লোকেরও বিবাহ হয়! আশ্চর্য্য!

রাধা রামায়ণ-মহাভারত পড়িত, আমি বসিয়া শুনিতাম। তাহার কণ্ঠের স্বরটুকু কি মিষ্ট! প্রদীপের আলো তাহার মুখে পড়িত, একমনে সুর করিয়া সে বহি পড়িত, আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম। বহির কথা কাণেই থাকিত, মনে পৌঁছিত না।

রাধা কাঁদিয়া-কাটিয়া একদিন পায় ধরিল, "চুরি ছাড়িতেই হইবে। চুরি করা পাপ, ঈশ্বর, রাগ করেন!"

পাপ, ঈশ্বর,—এত কথা বুঝিতাম না। রাধা কাঁদিবে, তাই চুরি ছাঁড়িব। রাধার চোখে জল পড়িবে, আর আমি—না, তখনই রাধার হাত ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, "আর কখনও চুরি করিব না।"

কখনও না! নূতন মানুষ হইব। চুরি করায় সুখই বা কি? জেলখানায় পচিয়া মরা, পাথর ভাঙ্গা, পাহারা'লার লাঠীর গুঁতা —এই ত!

খুঁজিয়া-সাধিয়া, পাটের কলে একটা চাকরীর জোগাড়

করিলাম। মন দিয়া কাজ করিতাম। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতাম—রাধার কত যত্ন, কত সেবা! আমার মনে হইত, আমি রাজা! কি সুখ, কি আনন্দ! কিন্তু এত সুখ সহিল না। সাহেবের নজরে পড়িয়াছিলাম, ইহাই ছিল, দলের লোকের হিংসার কারণ। লাগাইয়া ভাঙ্গাইয়া তাহারা আমার চাকরীটি ছিনাইয়া লইল। সাহেব একদিন গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। পথের ভিখারী আবার পথে দাঁড়াইলাম। যেন একটা সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া রাধাকে সকল কথা বলিলাম। রাধা দুঃখে-অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল! চোখের জল মুছিয়া রাধা কহিল, "কি করিবে বল, সবই অদৃষ্ট!"

অদৃষ্ট? না, কখনও নয়! এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এই তার পরিণাম? আর, এই সব পাষণ্ড, রাক্ষসগুলা—দাঁতে দাঁত ঘসিয়া রাগ সামলাইলাম। রাগ করিয়া লাভ কি? আক্রোশে, রাগে, আমার বুকের হাড়গুলা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহাদের তাহাতে কি ক্ষতি হইবে? কিছু না!

কিন্তু, চাকরী, চাকরী চাই। নহিলে, সংসার চলিবে কিসে? ছেলেটা কাঁদিয়া অস্থির, রাধার স্বস্তি নাই, বিশ্রাম নাই। উমেদারী করিয়া, মন যোগাইয়া, দিন-রাত ফিরিলাম, তবু চাকরী মিলিল না।

ক্রমে লোকের কাছে চাকরীর জন্য উমেদারী করিতে বিরক্তি ধরিয়া গেল। এই লোকগুলা গান গাহিয়া, গল্প করিয়া, সখ করিয়া

কত অর্থ নষ্ট করিতেছে, আর আমি একমুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতে পারি না। এও অদৃষ্ট!

শেষে মাঠে-ঘাটে শুইয়া, দিন কাটাইয়া, সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া রাধাকে বলিতাম, "চাকরী মিলিল না।"

রাধা একদিন গর্জ্জিয়া উঠিল—তাহারই বা দোষ কি? কত সে সহ্য করিবে? রাধা কহিল, "রাজ্যের লোক চাকরী করিতেছে, পয়সা আনিতেছে—তোমার বেলাই যত অনাসৃষ্টি ব্যাপার—চাকরী মিলে না!"

আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। রাধা, রাধা, তোমারই জন্য, এত কষ্ট করিতেছি—লোকের খোসামোদ করিয়া, চাকরীর ভিক্ষায়, দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছি, তবু মিলিতেছে না। কি করিব? তাহার জন্য সহানুভূতি নাই, সান্ত্বনা নাই, তুমিও তিরস্কার করিলে? গৃহেও কি আজ আমার জন্য একটা মিষ্ট কথা নাই, এমনই আমি লক্ষ্মীছাড়া?

পরদিন বাড়ী ফিরিলাম না। সন্ধ্যার সময় ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর ধারে আসিলাম। চারিধার নির্জ্জন। ছোট ঢেউগুলি কিনারায় আসিয়া লাগিতেছে। কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, এই শান্ত নদীর জল,—ডুবিয়া মরি। কিন্তু তখনই রাধার কথা মনে পড়িয়া গেল। অমনই মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠিলাম।

বরাবর সহরের মধ্যে আসিলাম। দত্তদের বড় বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম। চারিধার তখন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

ভাবিলাম, পণ রহিল না ত! ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া অস্থির, রাধার এত কষ্ট, রাগ, ভৎ'সনা, বাজারে চাকরী মিলে না। উপায় কি? যেমন করিয়া হোক, অর্থ চাই, অন্ন চাই! আবার আমি চুরি করিব।

তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল। জ্যোৎস্নার আলোকে চারিধার ভরিয়া গিয়াছিল। চুরির পক্ষে রাত্রিটা তত সুবিধার নহে। বড় বাড়ীর পিছন দিকে ঝোপের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বার খোলা ছিল! ভাবিলাম, ভগবান মুখ তুলিয়াছেন।

কি করিব? আমার দোষ কি? ভিক্ষা করিয়া অন্ন মিলে নাই, সন্ধান করিয়া চাকরী মিলে নাই, তাই চুরি করিতে আসিয়াছি। ছেলেটাকে বাঁচানো চাই, আর রাধা—তাহাদের কষ্ট,—না, কে বলে চুরি করা পাপ!

বরাবর সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম। দ্বার বন্ধ ছিল না। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, সন্দেহ নাই। এমন সুযোগও মিলে না। ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল—বায়ুস্পর্শে আলোকরশ্মি কাঁপিতেছিল।

নিঃশব্দে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

খাটে একটি মেয়ে ঘুমাইতেছিল—ছোট মেয়েটি। জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। আমি দাঁড়াইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিলাম, কি সুন্দর! কণ্ঠে একছড়া সোনার হার ছিল—লইব বলিয়া যেমন হাত বাড়াইব, অমনই আমার মনে পড়িয়া গেল, আমার ছেলের কথা!

—এ যেন তাহারই মত মুখখানি! না, না, এ হার আমি চুরি করিব না। সরিয়া আসিলাম। ঘুমাও, ঘুমাও বাছা, কোন ভয় নাই।

বাহিরে আসিতেই একটা লোকের সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল! সে ছুটিতেছিল, আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সে পলাইয়া গেল! আমি স্থির করিলাম, নিশ্চয়, এ চোর। এ-ই দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ব্যাপার বুঝিবার পূর্ব্বে কে আসিয়া সবলে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। আর, পৃষ্ঠে কি সে বজ্রমুষ্টি! আমি ধরা পড়িলাম। লোকটি কহিল, "বেটা চোর, চুরি করিয়া পলাইবি? দে জিনিস।"

এতদিন চুরি করি নাই, আজও না, তবু এ কি গ্রহ! আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। কহিলাম, "দোহাই মশায়, আমি কিছু জানি না।"

"না, তুমি সাধু! ভদ্রলোকের বাড়ী, এই রাত্রে আসিয়াছ, তুমি চোর নও। দরোয়ান!"

রীতিমত গোল বাধিয়া গেল। লাথি, চড়, ঘুসি—সব নীরবে সহ্য করিলাম। আমি নির্দ্দোষ, নির্দ্দোষ—কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করিবে?

সকলের মুখে একই কথা, "জিনিস বাহির কর্!" কোথায় জিনিস? কি জিনিস? আমি চোর ছিলাম বটে, কিন্তু আজ আমি চুরি করি নাই! আজ আমি নিষ্কলঙ্ক।

কেহ বিশ্বাস করিল না। তল্লাসি হইল; জিনিস মিলিল

না। সকলে বলিল, "বেটা লোক দিয়া জিনিস সরাইয়াছে। দাও, পুলিসে দাও। জেলে পচিয়া মরুক্।"

পুরানো নামের খাতিরে সহজেই আবার আমি চোর খাড়া হইলাম। দাগী চোর ঠিক করিয়া জজ সাহেব জেলের হুকুম দিলেন। পাঁচ বৎসর! ওঃ! ছেলেটি কি বাঁচিয়া থাকিবে, রাধা কি ইহা শুনিয়া একদণ্ড বাঁচিবে?

"ভগবান আপনার ভাল করিবেন, বাবু," বলিয়া গোষ্ঠ আমার পায়ের ধূলা লইতে চাহিল।

আমি চিঠিখানি পকেটে রাখিলাম। তখন জানালার ধার হইতে সূর্য্যের আলো সরিয়া গিয়াছিল। চারি দিক ম্লান হইয়া আসিতেছিল।

গোষ্ঠ কহিল, "বাবু, ঐ ফুলটি আমাকে দিবেন?" আমার হাতে একটি গোলাপ ফুল ছিল। জেলর বন্ধু উপহার দিয়াছিলেন। আমি সেটি গোষ্ঠর হাতে দিলাম। সে ঘ্রাণ লইয়া কহিল, "বাঃ, বেশ গন্ধ ত!" পরে আমার হাতে দিয়া কহিল, "এটি রাধাকে দিবেন, বলিবেন,—সে ফুল ভালবাসে, তাই আমি দিয়াছি। এটি যেন সে রাখিয়া দেয়—যতদিন না আমি খালাস পাই। আর তাহাকে দেখিবেন, অন্নাভাবে যেন সে মারা না যায়।" গোষ্ঠর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

পরদিন আমি স্বয়ং গোষ্ঠর বাড়ীর উদ্দেশে চলিলাম। দ্বার তালাবদ্ধ। পাশে মুদীর দোকানে গোষ্ঠর স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান লইলাম। মুদী কহিল, "সে কি আর আছে, বাবু!"

আমি কহিলাম, "কবে মারা গেল ?"

মুদী কহিল, "মলে ত ভাল ছিল, বাবু! নন্দর সঙ্গে সে পরশু রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একটি ছেলে ত—সেটাকে অবধি ফেলিয়া গিয়াছে,—এমন রাক্ষসী!"

আমি আশ্চর্য্যভাবে কহিলাম, "নন্দ ?"

মুদী কহিল, "হাঁ, ঐ যে গোষ্ঠর কাছে প্রায়ই সে আসিত।"

আমি কহিলাম, "আর ছেলেটি কোথায় ?"

"ঐটুকু ছেলে, কে তাকে দেখে ? মাঝেরগাঁর সনাতন বাবু অনাথ-আশ্রম খুলিয়াছেন, সেইখানে কাল আমি তাকে রাখিয়া আসিয়াছি, ছেলেটা তবু খাইয়া বাঁচিবে।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। ফুলটি হাতে ছিল, ফেলিয়া দিলাম না। পকেটে রাখিয়া সনাতন বাবুর অনাথ-আশ্রমের দিকে চলিলাম।

উদ্ধার।

১

একটি পুরানো কাহিনী। অনেক দিনের ঘটনা। তখন আমি কমিসেরিয়েটে প্রথম চাকরি পাইয়াছি। রাজপুত পদাতিকের দলে মিশিয়া টীরা অভিযানে সময়টা নিতান্ত মন্দ কাটাই নাই। এক সঙ্গে তাসখেলা, গল্প, গান প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গালীর জীবনে বেশ একটু বৈচিত্র্যেরও স্বাদ পাইয়াছিলাম।

প্রভু সিংএর সহিত সেদিন তাসের হ্যাপ খেলিতেছিলাম। কথায় কথায় প্রভুসিং কহিল, "অনেকদিনের একটা কথা মনে পড়ছে, বাবু!"

তখন বেশ একটু মিঠা বাতাস বহিতেছিল। তাঁবুর বাহিরে সমতল ভূমিটার উপর অসংখ্য ডালিয়া ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

আমি ভাবিলাম, মন্দ নয়! প্রভু সিংএর রোমান্স্ শুনা যাক্! রোমান্সের পক্ষে স্থান-কালও উপযুক্ত ছিল;—রণক্ষেত্র, পার্ব্বত্য ভূমি, রাজপুত সৈন্য, সবই ঠিক, অভাব কেবল রাজকন্যার!

আমি কহিলাম, "কি, প্রভুসিং?"

প্রভু সিং একখানি রৌপ্যপদক দেখাইয়া কহিল, "পড়ে দেখুন।"

আমি পড়িয়া দেখিলাম। শেষ আফগান যুদ্ধে পরাক্রম দেখাইয়া অজিত সিং এই পদক উপহার পাইয়াছিল।

ভাবিলাম, অজিত প্রভু সিংএর পুত্র কিম্বা কোন নিকট-আত্মীয় হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কাছে অজিত সিংহের পদক যে! অজিত তোমার কে?"

"কেউ না" বলিয়া প্রভু সিং আমার পানে চাহিয়া রহিল।

কল্পনা-কাতর, ভাবুক বাঙ্গালী ত আমি! আমার কাছে ব্যাপারটা এক অপূর্ব্ব রহস্যসমাচ্ছন্ন মনে হইতে লাগিল। কহিলাম, "ব্যাপার কি, প্রভু সিং?"

প্রভু সিং কহিল, "তবে শুনুন। সে আজ অনেক কালের কথা! তখন পাঁচ ছয় বৎসর আমি ফৌজে ঢুকিয়াছি। কেল্লার মধ্যে প্রেমারা খেলা চলিতেছিল—সঙ্গীদের উল্লাস-চীৎকারে খেলা রীতিমত জমিয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ আমার সঙ্গী বলিয়া উঠিল, "প্রভু সিং, পকেট সাবধান।"

নিমেষে একখানা নরম ছোট হাত আমার বজ্র মুষ্টির আয়ত্তে আসিল। সে অজিতের হাত। ছেলে মানুষ অজিত তখন সবেমাত্র আমাদের দলে আসিয়াছে। তখনও তাহার গোঁফের রেখা দেখা দেয় নাই, বেশ বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ! সে চোর! আমার পকেট হইতে সে একতাড়া বাঁধা নোট বাহির করিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। সে মুখ নত করিয়াছিল—বেচারা আকুল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে অপ্রতিভ দেখিয়া আমি কহিলাম, "ওহো, তাই ভাল,—অজিত! তা তোমার টাকাটা

নিয়েই যাও, আমার মনে ছিল না।" বলিয়া নোটের তাড়া অজিতের হাতে দিলাম; সঙ্গীর দিকে চাহিয়া কহিলাম, "অজিত আমার কাছে টাকাগুলা রাখিয়াছিল,—আমি দায়-মুক্ত হলাম। ওরই টাকা—"

সঙ্গীটির সহিত অজিতের আলাপ-পরিচয় ছিল না। সে আমার কথা বিশ্বাস করিল। আমাদের খেলা চলিতে লাগিল!

তারপর তিন দিন অজিতের কোন সন্ধান পাই নাই। ব্যাপার কি? তাহার সেদিনকার সেই বিষণ্ণ মুখ আমার প্রাণে বেশ একটি দাগ রাখিয়া গিয়াছিল। আমার সঙ্গে দেখা করিতে তাহার সঙ্কোচ ঘটিতেছে! সেদিন তাহার সুনাম খুব বাঁচিয়া গিয়াছে—ভাগ্যে আমার মাথায় বুদ্ধি জোগাইয়াছিল!

২

সে দিন সন্ধ্যাবেলা তাঁবুর ভিতর বসিয়া ছিলাম। হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না। আরদালি আসিয়া কহিল, "একটি স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে চাহে!" আমি আশ্চর্য্য হইলাম।

স্ত্রীলোকটির বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর হইবে। রাজপুতের গর্ব্ব তাহার শীর্ণ মুখ হইতে একেবারে ঝরিয়া যায় নাই।

স্ত্রীলোকটী কহিল, "আমি অজিতের মা! তার সব কথা শুনেছি। তার সুনাম যে রক্ষা করেছ, বাবা, সে জন্য ভগবান তোমার মঙ্গল করুন! অজিত এক কুহকিনীর মায়ায় পড়ে নিজের সর্ব্বনাশ করছে; তার খরচ-যোগানের জন্য উপায় না

দেখে চুরি করেছিল। সে এখন চোর! কিন্তু তুমি তাকে উদ্ধার করেছ, বাবা, না হলে কি হত, উঃ!"

বৃদ্ধা নারীর চোখে জল আসিয়াছিল। দেখিয়া আমার বড় কষ্ট বোধ হইল। আমি কহিলাম, "ছেলেবেলা অমন ভুল-চুক হওয়া তত ভাবনার কথা নয়, আমি তার সঙ্গে দেখা করব, যাতে সে ভাল হয় তা করব।" বৃদ্ধা কহিল, "সে কোথা চলে গেছে, তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। এই টাকা কটি তোমাকে দিতে বলেছিল।" বৃদ্ধা সে দিনকার নোটের তাড়া আমার সম্মুখে রাখিল।

৩

তখন আফগান যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে! আমাদের দল সেদিন বুনাদায় ছাউনি ফেলিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী লোক আসিয়া হাতে চিঠি দিল, অজিতের চিঠি,—পড়িলাম, অজিত লিখিয়াছে—

"যুদ্ধে আমি আহত হইয়াছি। এই পদক পুরস্কার পাইয়াছি! জীবনের বোধ হয় আর আশা নাই! এ পদক আপনাকে পাঠাইতেছি! সেদিন উদ্ধার না করিলে এ পদকে অধিকার হইত না! আমার নামের পদক আপনি পরিবেন; তাহা হইলে আমার মরণের সাধ মিটিবে, কোন দুঃখ থাকিবে না। একদিন যে চোর অপবাদে ধরা পড়িয়াছিল, আজ সে বীরের ন্যায় মরিতেছে, এ শুধু আপনার করুণার ফলেই! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

আমি পদকটি বুকে চাপিয়া ধরিলাম। চোখে এক ফোঁটা

জলও আসিয়াছিল। তখন মাথার উপর, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। যে লোকটি চিঠি আনিয়াছিল, সে বোধ হয়, তাহা দেখিতে পায় নাই!"

ডিটেক্‌টিভ।

১

কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া মার কাছে শুনিলাম, ননীদার কন্যা ডালিকে পাত্রপক্ষ আজ রাত্রে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন—আমার নিমন্ত্রণ। ননীদা ডাক্তার, এবং ডালি তাঁহার একমাত্র সন্তান।

একটা দুর্দ্দান্ত সাক্ষীকে জেরায় করায়ত্ত করিতে সেদিন রীতিমত বেগ পাইয়াছিলাম—শরীর ও মন কাজেই তেমন প্রকৃতিস্থ ছিল না। আমি কহিলাম, "আমার শরীরটা ভাল নেই, আজ—"

মা বলিলেন, "না গেলে নয়, সে বেচারা তা হলে ভারী দুঃখ করবে! অনেক করে বলে গেছে, আমাদের নিয়ে যাবার জন্যও কত জেদ করছিল—আমরা যেতে পারলাম না, আবার তুমিও যাবে না?"

অগত্যা একটু বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময় নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থি বাহির হইলাম।

নেটের পরদা ও এসেটীলিনের দুর্গন্ধ লইয়া বাড়ীটি উৎসবের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছিল। বাহিরের ঘর হইতে চেয়ার টেবিল সরাইয়া লওয়া হইয়াছে—তাহার স্থানে ঢালা বিছানা পড়িয়াছে।

গোটাকত তাকিয়া ও চারি পাঁচ জন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতে মিলিয়া কলিকাতার সঙ্কীর্ণ ঘরের সমস্ত স্থানটাই প্রায় জুড়িয়া ফেলিয়াছে!

আমাকে দেখিয়া ননীদার আর আনন্দ ধরে না, সকলের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, "ইনি আমার মামাত ভাই, আলিপুরের উকীল, মথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়!"

ঘরের কোণে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন—স্থূল আকৃতি, বর্ণ কৃষ্ণ, তবে ঘোর নহে। সসম্ভ্রমে তিনি দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আসুন মশায়, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আমার বড় ইচ্ছা ছিল। এতাবৎকাল ঘটে ওঠেনি।"

পরিচয়ে জানিলাম, তিনি সম্পর্কে ননীদার কি-রকম সম্বন্ধী, অবসরপ্রাপ্ত পুলিস-কর্ম্মচারী—ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কর্ম্ম করিতেন—সম্প্রতি পেন্সন লইয়া পল্লীভবন বর্দ্ধমানে বাস করিতেছেন, নাম করালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। কন্যার বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য সম্প্রতি দুই এক দিনের জন্য তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। ননীদা বলিলেন, "নাম শোননি, মথুর, উনি আবার দু-চারখানা বাঙ্গলা বইও লিখেছেন যে—কি নাম, আহা, মনে পড়ছে না!"

"বটে!" বলিয়া কোনমতে আমি স্থান সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

সাহিত্যিকের উপর অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের উপর কোন কালেই আমার এতটুকু সম্ভ্রম নাই। আমি তাহাদিগকে নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা নিরীহের দল বলিয়াই মনে করি। প্রকাশ্যে আমার অভিমত ব্যক্ত করিবার সময়, স্বভাবতই আমি একটু গর্ব্ব

অনুভব করি! ইহার বিরুদ্ধে বন্ধুগণের কোন যুক্তিই আমি গ্রাহ্য করি না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে চুপ করিয়া গেলাম। করালী বাবু পুলিস-কর্ম্মচারী হইয়া সাহিত্যের দিকে ঝুঁকিলেন কিরূপে, ইহা আমার নিকট এক বিরাট সমস্যা বলিয়া মনে হইল!

পাশের ঘরে ছেলেগুলা গ্রামোফোন লইয়া কান ঝালাপালা করিয়া তুলিয়াছিল! আমি কহিলাম, "এঁরা আসবেন কখন?"

করালীবাবু কহিলেন, "রাত আটটার পর কালরাত্রি কাটবে, সেই সময় তাঁরা যাত্রা করবেন! নিকটেই বাড়ী, এই বউবাজারে। পৌঁছুতে বড় জোর পনেরো-ষোল মিনিট লাগবে।"

তখন ঘড়ীতে সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। এতখানি সময় কি করিয়া কাটে! পলিটিক্সের আলোচনা সমীচীন নহে, সমাজতত্ত্বও নেহাৎ পুরানো হইয়া গিয়াছে! কাজেই করালী বাবুকে বলিলাম, "আপনার দু একটা গল্প বলুন না, মশায়।"

করালী বাবু বলিলেন, "আমার গল্প!"

একজন অভ্যাগত সোৎসাহে বলিলেন, "হাঁ মশায়, ডিটেক্‌টিভের গল্প! বইয়ে যত গাঁজাখুরী গল্প পড়া যায় বৈ ত নয়। অসহ্য! তবু আপনার মুখে সত্য ঘটনা দু একটা শোনা যাক্।"

আর একজন বলিলেন, "হাঁ, মানে আপনাদের কৌশলের কথা।"

করালী বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তবে শুনুন, একটা ঘটনার কথা বলি, ভারী আমোদ পাবেন আপনারা!"

ছেলেগুলা তখনও গ্রামোফোন চালাইতেছিল—যত বাজে গান! বিশ্রী গলা!

করালীবাবু হুঁকা রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অনেক দিনের কথা। প্রায় ষোল-সতেরো বৎসরের ঘটনা। বরাবর আমি পশ্চিমেই কাটাইয়াছি। তখন আমি গয়ার সদরে।

অফিসে বসিয়া আছি—সাহেব আসিয়া বলিলেন, "গাঙ্গুলী, একটা সুখবর আছে।"

আমি কহিলাম, "কি?"

সাহেব বলিলেন, "ছোট্টুর সন্ধান পাওয়া গেছে।" ছোট্টু দুর্দান্ত ডাকাত। তাহার জ্বালায় দেশের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি সবিস্ময়ে কহিলাম, "কোথায়?"

সাহেব বলিলেন, "তার ভাই বুদ্ধুর বাড়ীতে সে আসিয়াছে। বুদ্ধুর সঙ্গে তার বনিবনাও নাই, তবু ছোট্টু নিরাপদ ভাবিয়া সেখানেই বাসা লইয়াছে। বুদ্ধুর বাড়ী মরচুনায়। বুদ্ধু খবর লইয়া আসিয়াছে যে, যদি কোন চালাক লোক সঙ্গে যায়, তবে অনায়াসেই তাকে ধরা যায়। কিন্তু বেশী লোক নয়, এক জন হলেই ভাল—না হলে সে সন্দেহ করবে।"

আমি বলিলাম, "বুদ্ধুর কথায় বিশ্বাস কি? সে যদি তার সঙ্গে পরামর্শ করে এসে থাকে—আর মরচুনাও ত কাছে নয়, গয়া থেকে চৌদ্দ মাইল।"

সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "সেই জন্যই ত তোমার উপর ভার দেওয়া হচ্ছে।"

বুদ্ধুকে ডাকাইলাম। সে কহিল,—ছোট্টুর যখন সময় ভাল —সেই সময় বুদ্ধুর ছেলেটির বড় অসুখ হয়। একটা হকিম ডাকিয়া ঔষধ দেয়, এমন সামর্থ্যও তাহার ছিল না! মা-হারা ছেলে! ছোট্টুর কাছে সাহায্য চাহিয়া সে তাহা পায় নাই। ছেলেটি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়! সে কথা বুদ্ধু কখন ভুলিবে না। এখন ছোট্টুর আর তেমন সামর্থ্য নাই। দলের লোক-জন অনেক মরিয়া গিয়াছে, নিজেরও শরীর খারাপ, তাই সে ভাব করিয়া ভাইয়ের কাছে আসিয়াছে। বুদ্ধ তাহাকে ধরাইয়া দিয়া আজ পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবে। কথাগুলা বলিবার সময় বুদ্ধুর চোখ দুইটা বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছিল।

আমি কহিলাম, "তোমাকে বিশ্বাস কি ?"

বুদ্ধু কহিল, "বিশ্বাস না হয় ত এখনই জান্ লিন, বাবুসাহেব। আমি হারামি করিতে আসি নাই।"

সাহেব চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "দেখ, গাঙ্গুলী, ছোট্টুকে ধরিলে গবর্মেণ্ট রীতিমত পুরস্কার দিবেন।"

বুদ্ধুকে দেখিলে তাহার কথায় অবিশ্বাস হয় না! শীর্ণ দেহ, মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে, যেন দারিদ্র্য ও শোকের মূর্তিমান ছবি! বুদ্ধু বলিল, "বাবুসাহেব! আপনি যেন শিকার করিতে যাইতেছেন, বন্দুক নিন—শিকারীদের মত পোষাক পরুন।" অনেক সাহেব লোক শিকার করিতে যাইবার সময় তাহার সাহায্য গ্রহণ করে। তাহাতেই তাহার দিন চলে। ছোট্টু এ কথা

জানে, কাজেই তাহার কোন সন্দেহ হইবে না। এ কথাও বুদ্ধু আমাকে বলিয়া রাখিল।

২

সেই দিন শেষ রাত্রে 'স্যাম্পনি' লইয়া বুদ্ধুর সহিত মরচুনা যাত্রা করিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি! সহর ছাড়িয়া মাঠে পড়িলাম। দুই ধারে অড়হরের ক্ষেত। দূরে মাঝে-মাঝে ছোট পাহাড়ের মাথা জাগিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাস,—শীতও মন্দ ছিল না!

বেলা দশটার সময় পীরগাঁওয়ের পুলিস আউটপোষ্টের পাশ দিয়া গেলাম, কিন্তু সেখানে নামিলাম না। সেখানে পথের ধারে স্নানাহার সারিয়া লইলাম। পথে ডেপুটী মহেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রাণটা যেন বাঁচিল!

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি, মশায়? কোথা চলেছেন?"

আমি তাঁহাকে চুপি চুপি ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলাম। কথাটা ভাঙ্গিতাম না, তবে পাছে ডাকাতের হাতে 'গুম-খুন' হই, তবু ইহাঁরা সংবাদাদি লইয়া তাড়াতাড়ি একটা তদ্বির করিতে পারিবেন। এই জন্যই দ্বিধা বোধ করিলাম না। তাঁহাকে আরও বলিলাম, "দেখিবেন, কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ করিবেন না, একটু বেফাঁস হইলেই বেটা পলাইবে। সে ভারী হুঁসিয়ার। এই পাঁচ-সাত বৎসরেও তার কোন 'পাত্তা' পাওয়া যায় নাই!"

জিভ কাটিয়া মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "আরে, রামচন্দ্র!"

পীরগাঁও হইতে মরচুনা তিন ক্রোশ। কিয়দ্দূর যাইয়া

আমাদিগকে গাড়ী ছাড়িতে হইল। ক্রমেই পথ সরু হইয়া জঙ্গলের দিকে গিয়াছে। আমার গাটা ছম-ছম করিয়া উঠিল! বুদ্ধুর দিকে চাহিলাম,—বুদ্ধু কি বুঝিল, জানি না, সে কহিল, "পথ আছে বরাবর, বাবু সাহেব, তবে গাড়ী আর যাবে না। সাহেবরা এখানেই নামেন, বনে হরিণ বাঘ সবই পাওয়া যায়!"

শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া আমি বুদ্ধুর পশ্চাতে চলিলাম। বন্দুকে টোটা ভরিয়া রাখিলাম, পকেটে রিভলভারও ভরা ছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা চলিয়া বুদ্ধুর বাড়ী পঁহুছিলাম। চারিধারে আতা, খেজুর ও অন্যান্য গাছে জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। তাহারই মাঝে একটা জীর্ণ পাতার ঘর, পিছনে ছোট ডোবা। দ্বারের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড কুকুর শুইয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া সে ভীষণ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। আমি দুই পা হঠিয়া আসিলাম। বুদ্ধু কহিল, "চলে আসুন বাবু সাহেব, কোন ভয় নাই।" পরে কুকুরটির মাথা চাপড়াইয়া কহিল, "চুপ রও, শেরশাহ!" কুকুরটির নাম শের শাহ! দেখিলে 'শের' বলিয়াই মনে হয় বটে।

ঘরে আসিয়া বুদ্ধু একটা কাষ্ঠখণ্ড দেখাইয়া কহিল, "বসুন, বাবুসাহেব, ছোট্টু বাড়ীতে নাই, নিকটেই কোথা গিয়াছে। বোধ হয় এখনই আসিবে! রান্না তৈয়ার, এখনও খায় নাই, দেখিতেছি। সে জানে, আমি ডুরান সাহেবের কাছে গিয়াছি। ও বড় শিকারী সাহেব।" আমি বসিলাম।

আমার ভয় হইতেছিল, এই বিজন বন, একেলা আমি, ইহারা

কত লোক আছে, তাহার ঠিক কি? আর ঐ ত প্রকাণ্ড কুকুর, একটা ইঙ্গিতে আমাকে এখনই টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু,—শাস্ত্রের বচন পড়িয়া রহিয়াছে! লোভে পড়িয়া আজ প্রাণ দিতে আসিয়াছি। আতঙ্কে শিহরিয়া ভাবিলাম, কোনমতে যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই ত, পুলিশের চাকুরী ছাড়িয়া দিব।

বুদ্ধু কহিল, "ঐ যে কুকুর দেখলেন, বাবু সাহেব, ওটা ছোট্টুর। পুলিসের লোক দেখলেই ও চীৎকার করে সাবধান করে দেয়, তাই আপনাকে কোন লোক আনিতে বারণ করেছিলাম। পাছে সে সন্দেহ করে পলায়।"

আমি একটা সিগার ধরাইয়া ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিলাম। ঘরের ভিতরকার চাল ঝুলে ভরিয়া গিয়াছে—কোণে একটা চুল্লী, একটা হাঁড়ী ও দুই-তিনখানা বড় শালপাতা পড়িয়া রহিয়াছে! বাহিরে দুই-একটা পাখী ডাকিতেছিল। আমি কেবল ভাবিতেছিলাম, আর কি বাড়ী ফিরিব?

বুদ্ধু আসিয়া চুপি চুপি কহিল, "ছোট্টু আস্‌ছে, বাবু সাহেব, দেখবেন, হুঁসিয়ার।"

একটি লোক ঘরে প্রবেশ করিল। দীর্ঘাকার পুরুষ, রোগে ও বার্দ্ধক্যেও মাংসপেশীগুলা একেবারে ঝরিয়া যায় নাই। কপালে দাগ পড়িয়াছে। চোখ দুইটা কোটরগত হইলেও এখনও তাহাতে বেশ যেন তেজ আছে। ঘাড়ে এক প্রকাণ্ড লাঠী।

আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া

রহিলাম। লোকটি যে যুবা বয়সে অসাধারণ জোয়ান ছিল, তাহা এখনও তাহাকে দেখিলে বেশ বুঝা যায়।

বুদ্ধ কহিল, "ছোট্টু, বাবুসাহেব বড় শিকারী। ডুরান সাহেবের দোস্ত্। বাঘ শিকারে আসিয়াছেন!"

ছোট্টু কহিল, "আপনি একেলা আসিয়াছেন?"

কথাগুলায় তেজ কি! বুদ্ধুর কথাগুলা শুনিলে মনে হয়, যেন সে বেচারা জীবনে বড় দাগা পাইয়াছে—সর্ব্বদাই একটি আশ্রয় চাহে—দরিদ্রের চিরাভ্যস্ত বিনয়নম্র স্বর! আর এ যেন আত্মনির্ভরসম্পন্ন বলবান কণ্ঠস্বর! কথাগুলা সজোরে কানে আসিয়া লাগে। আমার ধারণা যথার্থ কি না, তাহা জানি না; তবে তখন আমার এইরূপই মনে হইয়াছিল।

আমি কহিলাম, "একলাই আসিয়াছি—তারপর তোমাদের লোকজন নাই কি?"

ছোট্টু হাসিয়া কহিল, "আমাদের লোকজন! আর বাবুসাহেব, অজন্মার জ্বালায় দেশ উজাড় হইয়া গেল, আমাদের লোকজন! তবে বুদ্ধু বড় ওস্তাদ।"

ছোট্টু আমার দিকে চাহিতেছিল। যে চাহনিতে অন্তরের সকল গুপ্ত রহস্য ধরা পড়িয়া যায়, এমন চাহনি,—তেমনই তীক্ষ্ণ ও তীব্র!

আমার গা-টা ছম্ ছম্ করিতেছিল!

তার পর ছোট্টু লাঠী রাখিয়া খাইতে বসিল। বুদ্ধু বলিল, "আমি কিছু খাব না।"

ছোট্টূ শালপাতায় ভাত ঢালিল। ভাতের রাশি! আমাদের মত তিনটা লোকের আহার! আমি কেমন-এক ভাবে তাহার দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছিলাম—লাল রঙ্গের মোটা ভাত—তাহাতে হড় হড় করিয়া করিয়া অড়হরের ডাল ঢালিয়া সে খাইতে আরম্ভ করিল।

বেচারার ক্ষুধা বোধ হয় হয় খুবই প্রবল ছিল—খাইবার সময় কোন দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না।

বুদ্ধু আমার প্রতি ইঙ্গিত করিল। আমি ঘাড় নাড়িলাম। আহা, অন্নের গ্রাস ছিনাইয়া ধরিব? না, না, প্রাণ ভরিয়া খাইয়া লউক! আর ত এমন খাইতে পাইবে না! খাওয়া শেষ হইলে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিব না।

আমি বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এই সেই প্রবল দস্যু—যাহার দৌরাত্ম্যে সমস্ত দেশ 'থরথরি-কম্পমান'—আজ আমার সম্মুখে। যাহাকে ধরিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে—আজ রোগশীর্ণ, বলহীন, সেই বৃদ্ধ দস্যু আমার কবলের মধ্যে—মনে করিলেই ধরিব—তার পর রাজসরকারে কি নাম—বখশিস্ প্রোমোশনের কি সে ঘটা! দারুণ আগ্রহে আমার হাত অবধি কাঁপিতেছিল,—এখনই উহাকে সবলে চাপিয়া ধরিব, তারপর বুদ্ধুর সাহায্যে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিব—বন্দুকের একটি গুলিতে কুকুরটির ভবলীলা সাঙ্গ হইবে—বুদ্ধূ পীরগাঁওয়ের আউটপোষ্টে খবর দিবে, এবং তার পর আমি রাজসম্মানে গয়ায় ফিরিব!

হঠাৎ বাহিরে কুকুরটা ডাকিয়া উঠিল। অন্ন ফেলিয়া ছোট্টূ

নিমেষে বাহির হইয়া গেল—তখনই ঘরে ঢুকিয়া লাঠীখানা ঘাড়ে লইয়া আবার সে বাহিরে চলিয়া গেল। চক্ষের পলক পড়িবার অবকাশ ছিল না—এত শীঘ্র কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল! বুদ্ধু কহিল, "বাবু, করলেন কি? ও যে পালাল!"

"সে কি?" বলিয়া লাফাইয়া আমি বাহিরে আসিলাম। দেখি, অদূরে একদল চৌকিদার, সঙ্গে জমাদার,—সকলে সেই দিকেই আসিতেছে।

চকিতে তাহারা আসিয়া পড়িল! আসিয়াই আমাকে ও বুদ্ধুকে বাঁধিয়া ফেলিল! আমরা কহিলাম, "ব্যাপার কি?"

তাহারা কহিল, "পীরগাঁওয়ের দারোগা সাহেব খবর পাইয়াছেন, ছোট্টু ডাকাত বনের মধ্যে বুদ্ধুর ঘরে আসিয়াছে। তিনি কোনও কাজে এখনই সদরে চলিয়া গেলেন—যাইবার সময় আমাদিগকে হুকুম দিয়া গিয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "সে পলাইয়াছে! আমি যে তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছিলাম!"

কিন্তু সে কথা কে শোনে? নূতন বেহারী জমাদার—নাম কিনিবার তাঁহার বিরাট আগ্রহ,—আমাকে অকথ্য গালি দিয়া হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া চালান দিল! আমি ভয় দেখাইলাম, সহজভাবে ব্যাপার বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই জমাদার সাহেবের মনে বিশ্বাস হইল না। তিনি আমাকে 'পাকা বদমায়েশ, শয়তান' প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত করিয়া দুইটা রুলের গুঁতা দিতেও ছাড়িলেন না! বুদ্ধুর দুর্দ্দশার মাত্রা আরও অধিক! কিন্তু চোরা

না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! আবার এমনই দুর্ভাগ্য মশায়, যে পীরগাঁওয়ের দারোগা বাবুও অন্তর্হিত। সে তবু আমাকে চিনিতে পারিত! গায়ের ঝাল গায় মাখিতে হইল! হা ভগবান্! ভাবিলাম, ক্ষুধিতের অন্নের গ্রাস কাড়িবার সঙ্কল্প করিতেছিলাম, তাই কি এই দুর্দ্দশা? যখন পীরগাঁওয়ে পঁহুছিলাম, তখন সন্ধ্যা। সেই শীতের সন্ধ্যাতেই গয়াতে চালান হইলাম! সারা পথ, পদব্রজে! অপমানে, ক্রোধে, ক্ষুধার জ্বালায়, জ্ঞান ছিল না—কোন্ পথ ধরিয়া কতক্ষণ যে চলিলাম, কিছু হুঁস ছিল না!”

৩

আমরা খুব হাসিতে লাগিলাম। করালী বাবু বলিতে লাগিলেন, “বেলা সাড়ে নয়টায় জমাদার-চৌকিদারের দল আমাকে ও বুদ্ধুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিল। তিনি আমাকে চিনিতেন,—এতদবস্থায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! মুক্তি পাইয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম! গর্দ্দভ জমাদার ও তাহার চৌকিদারগুলাকে তিনি অজস্র গালি দিলেন।

সংবাদ পাইয়া আমার সাহেবও আসিলেন! সমস্ত শুনিয়া তিনি ত হাসিয়াই খুন!

পীরগাঁওয়ের দারোগা সাহেব কহিলেন, গয়ার ডেপুটী বাবু মফঃস্বল-তদারকে আসিয়া তাহাকে সংবাদ দেন, ছোট্টু ডাকাত এবার ধরা পড়িবে। কথায়-কথায় তিনি বলেন, মরচুনায় তাহার ভাইয়ের বাড়ীতে সে আছে—ডিটেকটিভ সাহেব ধরিতে গিয়াছেন।

তাই এখানে চলিয়া আসিবার সময় তিনি দারোগাকে তাঁহার সাহা-য্যের জন্য চৌকিদার লইয়া যাইতে বলেন! শেষে এই গোল বাধিয়াছে, ইত্যাদি! অর্থাৎ, আমাকে শুদ্ধ চালান দিয়া বসিয়াছে।

আমি মুক্তি পাইলাম। কিন্তু ডাকাতকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে বেচারা বৃদ্ধ বিচারের জন্য প্রেরিত হইল। সে কবে মুক্তি পাইল, তাহা জানি না। কারণ, আমাকে দুই তিন দিন পরেই জাল নোট ধরিবার কাজে একেবারে বক্সারে চলিয়া আসিতে হইল! তবে ছোট্টু ডাকাতের যে সেই অবধি আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তাহা বেশ জানি।"

আমি কহিলাম, "ওহো! বক্সারের জাল নোট! সে ত একটা ভারী রোমান্সের ব্যাপার! শুনি, শুনি—"

এমন সময় বাহিরে গাড়ী থামিল! নন্দীদা কহিলেন, "এই এঁরা এসেছেন।" কুটুম্বদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমরা শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলাম। জাল নোটের গল্প শুনিবার আর অবসর ঘটিল না!

অভিনেতা।

১

এক তরুণ যুবক আসিয়া কমলা থিয়েটারের ম্যানেজারের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল।

ম্যানেজার কহিল, "কি রকম চাকরি চাই?"

যুবকের নাম মোহিত। সে কহিল, "আমি অভিনয় করব।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ম্যানেজার কহিল, "সেটা আপনার অভিনয় না দেখে কি করে ঠিক করি?"

মোহিত কহিল, "আপনাকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে না পারি যদি ত, ছাড়িয়ে দেবেন!"

ম্যানেজার কহিল, "সম্প্রতি আমার লোকের দরকার নাই যদিও—তবু আপনি যখন চাকরির একান্ত প্রার্থী—আপনাকে ফেরাতে পারি না। কিন্তু মাহিনা বেশী মিলবে না।"

একটা ঢোক গিলিয়া মোহিত কহিল, "বেশী ত আমি চাই না!"

ম্যানেজার কহিল, "আপাতত পনেরো টাকা মিলবে—তার-পর উন্নতি দেখাতে পারলে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেব।"

একবার আকাশের দিকে চাহিয়া মোহিত কহিল, "তাতেই আমার হবে!"

ম্যানেজার তখন থিয়েটারের নকলনবীশকে ডাকিল, "যাদব বাবু, এই নতুন বাবুটিকে সেই দূতের পার্টটা লিখে দিন ত!" তারপর মোহিতের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তাহলে কালই আপনি রিহার্সাল দিতে আসবেন—পার্ট আজই পাবেন—পরশু শনিবার "হেমচন্দ্র" নাটক আছে—তাতে দূতের পার্টটা! পার্টটা মন্দ নয়!"

২

দূত, সৈনিক, নাগরিক প্রভৃতির পার্ট লইয়াই মোহিত সন্তুষ্ট হইল! নূতন আসিয়া সে বড় পার্ট আশা করিতে পারে না! থিয়েটারের আদালতে এমন বে-আইনী কাজ আর দুইটি নাই—দূত সাজিয়া—দূতের কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, আদবকায়দা ও চলা-ফেরায় সে একটা নূতনত্ব আনিল। থিয়েটারের লোকের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিলেও সমজদার দর্শকের চক্ষে সেটি ভাল লাগিল। সেই বিড়ম্বনাময় ভাবভঙ্গী, গোবেচারার মত কথাবার্তা, মাত্রাজ্ঞানবর্জ্জিত কৃত্রিম অভিনয়ের হাত এড়াইয়া দর্শক যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল! বইয়ের কথাগুলিই সে আবৃত্তি করিয়া যায়—নাট্যকার ও নাটকের মুণ্ডপাত করিয়া কুৎসিত বা অবান্তর কথা-বার্ত্তার অবতারণা করে না—দুই একটি কথা যাহা বলে, তাহাতে বেশ একটা শান্ত নম্র সুর—দূতোচিত শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল বলিয়াই তাহা মনে হয়।

দূত সাজিয়া, প্রহরী সাজিয়া, সে যখন দেখিত, নাটকের নায়ক

বীভৎস চীৎকারে থিয়েটারের ছাদ বিদীর্ণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে, তখন তাহার বোধ হইত, যেন বুকের মধ্যে কে মুগুরের ঘা মারিতেছে! কিন্তু সে কোন কথা কহিত না—কারণ তাহার পক্ষে এ সকল বিষয়ের আলোচনা অনধিকার-চর্চ্চামাত্র!

পনেরো টাকাতে কোনদিন সে অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই। তাহার অভাব পূরণ হইলেই যথেষ্ট! সে অর্থের কাঙ্গাল ছিল না।

একদিন সে বেচারাও সুখের মুখ দেখিয়াছিল! ধন-জন-প্রেম-স্নেহ কিছুরই অভাব ছিল না। পৃথিবীর চারিধার উজ্জ্বল ছিল—মাথার উপর নির্ম্মল আকাশ মেঘশূন্য, প্রাণেও সুগভীর পরিতৃপ্তি! তারপর সহসা কোন্ এক অশুভ মুহূর্ত্তে সারা আকাশ কালো মেঘে ভরিয়া আসিল, চারিধার আঁধার হইয়া গেল। এক গোপন-ছিদ্রের মধ্য দিয়া বেদনার স্রোত প্রবেশ করিয়া তাহার সকল সুখ ভাসাইয়া দিল! বিপদের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আবার যখন সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন আকাশে আলো নাই, বাতাসে শীতলতা নাই, প্রাণে সুখ নাই! সে কি মহাঝঞ্ঝা সহসা আসিয়া নিমেষে সমস্ত উলটপালট করিয়া দিয়া গিয়াছে!

মোহিত এক নারীকে ভালবাসিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রী নহে। কিন্তু স্ত্রীর অধিক বেচারা তাহাকে ভালবাসিয়াছিল। কবি আপনার কাব্যকে যেমন ভালবাসে, ভক্ত আপনার দেবতাকে যেমন

ভালবাসে, তেমন ভালবাসিয়াছিল। যে ভালবাসার মোহনস্পর্শে এই পৃথিবীতে স্বর্গ নামিয়া আসে,—সেই ভালবাসা! তাহা যেমন গভীর, তেমনই অসীম। কিন্তু নারী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, সে একনিষ্ঠ প্রেমের অমর্য্যাদা করিল! মোহিতের মোহ-স্বপ্ন একটি আঘাতে সে ভঙ্গ করিয়া দিল। হায়, নারী! হায়, কুহকিনী!

সেদিন হইতে জীর্ণ হৃদয় লইয়া মোহিত শান্তির আশায় অনেক ছুটাছুটি করিয়াছে—কোথাও শান্তি মিলে নাই। অবশেষে থিয়েটার দেখিতে দেখিতে একদিন সে তন্ময় হইয়া গেল! আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়া এই যে বিভিন্ন চরিত্রের আবরণে ক্ষণিক সুখ, ক্ষণিক দুঃখের চকিত স্পর্শ—ইহার মধ্যে আপনাকে মগ্ন করিয়া দিয়া সে এক নূতন জীবনের স্বাদ-গ্রহণে কাতর হইল!

৩

থিয়েটারওয়ালারা এক নূতন নাটক-অভিনয়ের আয়োজনে বিপুল উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছিল! প্রসিদ্ধ নাট্যকার বিনোদ চক্রবর্ত্তীর "সীতা-নির্ব্বাসন।" সহরের কর্ম্মস্রোত ঠেলিয়া সে আয়োজনের আঘাত নরনারীর দ্বারে আসিয়া লাগিয়াছিল।

অভিনয়ের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে সহরের চারিধারে রঙ-বেরঙের কাগজে সুবৃহৎ অক্ষরে নূতন নাটক যেন চীৎকার করিয়া দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল।

শনিবার প্রভাতে ম্যানেজার সংবাদ পাইল,—অভিনেতা গোকুল প্রামাণিকের প্রবল জ্বর হইয়াছে। সর্ব্বনাশ! সে যে লক্ষ্মণ সাজিবে! এখন উপায়? প্রধান ভূমিকা গ্রহণের যোগ্য

লোক এই অল্প সময়ে কেমন করিয়া মিলিবে? মাথায় হাত দিয়া ম্যানেজার বসিয়া পড়িল! শত্রুর টিটকারী, দর্শকের লাঞ্ছনা, সমালোচকের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি—ম্যানেজারের সম্মুখে নিমেষে যেন বিকট শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল!

মোহিত আসিয়া ম্যানেজারকে কহিল, "একটি বাবু ষোল-টাকার বক্স রিজার্ভ করবেন—বাহিরে তাঁর লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

ম্যানেজার বলিল, "আর বক্স রিজার্ভ—এদিকে মহা সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

মোহিত চমকিয়া উঠিল! ধীরস্বরে কহিল, "আজ্ঞে?"

ম্যানেজার কহিল, "গোকুলের ভয়ানক জ্বর হয়েছে! সময়ও পেলে না সে আর জ্বর করবার—এখন লক্ষ্মণ সাজে কে? অত বড় পার্ট—শক্ত পার্ট—এই ক'ঘণ্টায় তৈরি করে নেওয়া কি সহজ কাজ! এত দিন ধরে উদ্যোগ করলুম—দেখছি সে শুধু শত্রু হাসানর জন্য।"

মোহিত কহিল, "এমন কেউ কি নেই, থিয়েটারে?"

ম্যানেজার চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া বলিল, "তাহলে আর ভাবনা কি ছিল, ছাই!"

মোহিত অত্যন্ত ধীরস্বরে কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "আজ্ঞে, যদি কিছু মনে না করেন, ত আমি চেষ্টা দেখতে পারি।"

অবজ্ঞার সহিত ম্যানেজার কহিল, "অত বড় পার্ট তুমি পারবে! তুমি ত দূত আর সৈনিক সেজেই কাটালে!"

কথাটা বলিয়াই ম্যানেজারের মনে পড়িল—মোহিত শুধু দূত ও সৈনিক সাজিয়াছে বটে—কিন্তু তাহাতেও সে একটু বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছে। "দংষ্ট্রা" সংবাদপত্র "রতনচাঁদ" নাটকের সমালোচনায় দূতের ভূমিকার বিশেষ করিয়াই উল্লেখ করিয়াছিল। বিপদের সময় লোকে একগাছি তৃণকেও অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে—সুতরাং মোহিত এ ক্ষেত্রে লক্ষ্মণের ভূমিকা-গ্রহণে অনুমতি পাইল।

৪

সারাপথ মোহিত তন্দ্রাবিষ্টভাবে চলিল। সে শুধু ভাবিতেছিল, লক্ষ্মণের কথা! সে যেন আজ আর মোহিত নহে—লক্ষ্মণ! এই গাড়ী-ট্রাম-ঘর্ঘরিত, জনসংঘপরিপূরিত কলিকাতার রাস্তার কথা তাহার মনেও ছিল না। সে যেন সরযূর তীর ধরিয়া অযোধ্যার পথে চলিয়াছে—সীতাদেবীকে বনে নিরাশ্রয়া ফেলিয়া হৃদয়ে দারুণ ভার লইয়া সে চলিয়াছে—গাছের পাতার মধ্য দিয়া বায়ু কাঁদিয়া ফিরিতেছে, নদীর জল কি এক গভীর বেদনায় স্থির অচঞ্চল হইয়া গিয়াছে! আকাশের আপ্রান্ত ভীষণ কালো মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—চারিধারে প্রকৃতি স্তম্ভিত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে! ভীষণ বজ্রনাদে ও বিপুল বারিপাতে, নিমেষে যেন স্তম্ভিত বেদনা সাড়া দিয়া উঠিল—লক্ষ্মণ মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িল!

রাত্রে ভিড় ঠেলিয়া মোহিত যখন থিয়েটারের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখনও একটা স্বপ্নাবেশ তাহাকে ঘিরিয়াছিল—কানের

কাছে শোকার্ত্ত বায়ু হা-হা করিতেছিল চোখের সম্মুখে সরযূর জল স্থির হইয়া গিয়াছিল,—সীতার দুঃখকাতর মলিন মুখ বুকের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল।

সে রাত্রে অভিনয় দেখিয়া দর্শকের দল কাঁদিয়া সারা হইয়া গেল। কলিকাতার চাকচিক্যময় রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র পট, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কথা ভুলিয়া গিয়া দর্শকের মনে হইল, যেন তাহারা এ যুগের লোক নহে—সেই ত্রেতাযুগে অযোধ্যার পথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জানকীশোকে কাতর মলিন লক্ষ্মণকে বন হইতে সদ্য ফিরিতে দেখিতেছে! অভিনয়েও কি অকৃত্রিম আন্তরিকতা! অভিনয় করিতে করিতে মোহিত নিজে কাঁদিয়া সারা হইয়া গিয়াছিল।

সাজঘরে ম্যানেজার স্বয়ং আসিয়া মোহিতের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "ভাই, আজ বড় মান রেখেছ। তোমার পাঁচ টাকা মাহিনা বাড়িয়ে দিলুম, কাল থেকে তোমার মাহিনা হল, কুড়ি টাকা।"

সে কথা মোহিতের কানেও গেল না। অভিনয়ের ভাবে সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল!

পরদিন লক্ষ্মণের অভিনয়-কৌশলের কথা সহর ব্যাপিয়া বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গেল! "সীতা-নির্ব্বাসনের" অভিনয়ে ম্যানেজার ব্যাঙ্কে আপনার তহবিল চতুর্গুণ ভরাইয়া ফেলিল। নাট্যকারের প্রতিষ্ঠাও দৃঢ়তর হইল।

থিয়েটারে মোহিতের শ্রদ্ধা ও সম্মান বাড়িয়া গেল। এবং বিনোদ চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে ম্যানেজার মহা উৎসাহে "কৃষ্ণকান্তের

উইল” অভিনয়ের আয়োজন করিল। গোবিন্দলালের ভূমিকা গ্রহণ করিবে, মোহিত।

মোহিতের অন্তর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কি মূর্খ এই গোবিন্দলাল! সাধ্বী পত্নীর অযাচিত প্রণয়-ধারায় সন্দেহ করিয়া বসিল—এমন প্রেম, এমন স্বর্গ, পদাঘাতে দূর করিয়া সে কোন নরকের জঞ্জাল মাথায় তুলিয়া লইল! কি নির্ব্বোধ, কি নির্ম্মম! তারপর রোহিণীর পৈশাচিক ব্যবহার! মোহিতের মনে হইল, তাহাকে দেখিতে পাইলে এখনই সে রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরে! উত্তেজনায় মোহিতের হাত কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

অভিনয়-রাত্রে উত্তেজনার ঘোরে রোহিণীকে সত্যই সে একটা পদাঘাত করিল। স্তম্ভিত দর্শকের দল মূক হইয়া বসিয়াছিল। পরিপূর্ণ রঙ্গালয়ে এতটুকু শব্দ ছিল না। নিস্তব্ধভাবে সকলে অভিনয় দেখিতেছিল। রোহিণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের সারা বার্ণার্ড শ্রীমতী চপলাসুন্দরী! চপলা মাথায় আঘাত লইয়া ম্যানেজারের নিকট আসিয়া নালিশ করিল না, অপর অভিনেতারা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! ম্যানেজার স্বচক্ষে তাহা দেখিলেও মোহিতকে কোন কথা বলিল না।

চম্পা থিয়েটারের ম্যানেজার আসিয়া একদিন মোহিতকে বলিল, “আপনি আমার থিয়েটারে চলুন!”

মোহিত কহিল, “কেন?”

ম্যানেজার কহিল, "আপনাকে পঞ্চাশ টাকা মাহিনা দোব!"

মোহিত কহিল "কোন প্রয়োজন দেখি না।"

ম্যানেজার কহিল, "এখানে ত মোটে পঁচিশ টাকা মাহিনা পাচ্ছেন—আচ্ছা, আমি একশ টাকা দোব।"

মোহিত কহিল, "টাকার আমি প্রত্যাশী নই। পঁচিশ টাকাতে আমার সমস্ত অভাবই পূর্ণ হয়।"

৫

পথের ধারে খোলার বাড়ী। আপনার ঘরে বসিয়া মোহিত কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" পড়িতেছিল, এমন সময় একখানা বড় গাড়ী আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ীর দ্বার খুলিয়া এক সালঙ্কৃতা সুন্দরী রমণী নামিয়া আসিল। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "মোহিত বাবু—"

মোহিত চাহিয়া দেখে, সে রাত্রের রোহিণী! অভিনেত্রী চপলা। মোহিত কহিল, "আপনার কিছু কি দরকার আছে?"

চপলা কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। মোহিত আবার কহিল, "কি চাই, আপনার?"

চপলা কহিল, "সেদিন যখন আপনি গোবিন্দলালের ভূমিকা অভিনয় করছিলেন, রোহিণী সেজে তখন আমি এক নূতন সুখের স্বাদ পেয়েছি।"

মোহিত কহিল, "কি সে?"

চপলা কহিল, "নিজের জীবনের উপর আমার ঘৃণা হয়ে

গেছে। এই অভিনেত্রীর জীবন! আপনি যখন আমাকে অত আদরের কথা বলছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, আমার পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবী সরে গেছে—যেন আমাদের চারিধারে আর কেউ কোথাও নেই! আপনি একমাত্র পুরুষ আর আমি একমাত্র নারী। ভালবাসার এমন নিবিড় বন্ধনে আর কেউ কখনও বাঁধা পড়েনি। তারপর নিশাকরের সঙ্গে দেখা করা—আমি খালি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোতা পাখীর মত শেখা বুলি বলে যাচ্ছিলাম! আপনি যখন আমার অঙ্গে পদাঘাত করলেন, তখন থেকে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আপনার পায়ের তলায় পড়ে মলেম না কেন!" মোহিত কোন কথা কহিল না।

চপলা কহিল, "তারপর থেকে একটা কথা কেবলই মনে হচ্ছে! যদি অভয় পাই ত বলি!"

মোহিত কহিল, "বল!"

চপলা কহিল, "ভালবাসার জন্য আমার সমস্ত প্রাণ তৃষিত হয়ে রয়েছে—সংসারের স্বাদ পাবার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠেছি। দয়া করে চরণে স্থান দিন, আমাকে। স্ত্রী বলে নয়, দাসী বলে!"

মোহিত কহিল, "তা হয় না, চপলা।"

চপলা কহিল, "কেন হয় না? দয়া করে আমায় গ্রহণ করুন। আমার সমস্ত পাপ ধূয়ে দিন, আমাকে পবিত্র করুন।"

মোহিত কথা কহিল না।

চপলা কহিল, "কেন হয় না, জানতে পারি কি?"

মোহিত কহিল, "কেন, তা বলতে পারব না—তবে হয় না—যদি আমাকে ভালবেসে থাক ত একটা কথা বলি, রাখবে?"

চপলা কহিল, "কি কথা?"

মোহিত কহিল, "বাড়ী যাও।"

৭

পরদিন অপরাহ্নে আবার মোহিতের দ্বারে চপলার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল! চপলা আসিয়া মোহিতকে প্রণাম করিল।

মোহিত কহিল, "আবার এসেছ!"

চপলা কহিল, "এসেছি। আপনি আমাকে টেনে এনেছেন। কোথাও আমার সুখ নাই। আমাকে চরণে স্থান দিন! দেবতার কাছে পাপীর পুণ্য প্রার্থনাও পূর্ণ হয়, সেই আশায় এসেছি। ম্যানেজারকে চিঠি লিখে আমি থিয়েটার ছেড়েছি—আজ সে চিঠি পাঠিয়ে দিছি। আপনার চরণ-সেবার ভার দিন—কিছু চাহি না—শুধু আপনার ভালবাসা! সেদিন অভিনয়ে যেমন আদরের কথা বলেছিলেন, আজ সত্য করে তেমনই একবার বলুন, "ভালবাসি।" আমার আর কোন সাধ নাই!"

মোহিত কহিল, "কাল থেকে আমারও সব গোলমাল হয়ে গেছে—কেবলই আমি ভেবেছি।"

চপলা অধীরভাবে মোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মোহিত কহিল, "ভেবে দেখলাম, তা হতে পারে না!"

চপলা কহিল, "কি হতে পারে না?"

মোহিত কহিল, "তোমায় আমায় কোন সম্বন্ধ !"

চপলা কহিল, "কেন ?"

মোহিত গম্ভীরস্বরে কহিল, "শুনবে ?"

চপলা শিহরিয়া উঠিল ! মোহিত কহিল, "আমি তোমাকে চিনেছি, তুমি চারু ! যে প্রেম জগতে আমার একমাত্র সম্বল ছিল, সে প্রেম তুমিই হরণ করে নিয়ে গেছ ! তুমি আমাকে একদিন শ্রেষ্ঠ সুখ দিয়েছিলে—আবার দারুণ কষ্ট,—তা তুমিই দিয়েছ। একদিন তোমাকে আমার সর্ব্বস্বই আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তা ধূলায় ফেলে দিয়ে চলে গেছলে—আজ আবার নূতন করে তা ফুটিয়ে তোলা যায় না, চারু !"

চপলা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মৃদু হাসিয়া মোহিত কহিল, "তুমি আমাকে চিনতে পারনি, আমার এমন পরিবর্ত্তন হয়েছে ! মোহিত আমার ছদ্মনাম, আমি রমেশ।"

চপলার মাথা ঝিম ঝিম করিতেছিল, নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছিল। সে ভূতলে শির লুণ্ঠিত করিল ; তারপর যখন মাথা তুলিল, তখন মোহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে, শূন্য ঘরে সে একাকিনী !

রসভঙ্গ।

১

রমেন্দ্রনাথ কবি না হইলেও কবিতারসজ্ঞ বটে! তাহার ঘরের পরিচ্ছন্ন আলমারিগুলি নানাবিধ কবিতাপুস্তকে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের "মানসী", "খেয়া" হইতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি মকরন্দ ঘোষের "পট্টাম্বরা," "অট্টহাসি" অবধি বাদ যায় নাই!

তরুণ বয়স ও স্বাস্থ্য-ধন-জনের অধিকারী হইয়া এবং কলিকাতা সহরে বাস করিয়াও, নগর-সুলভ উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-বিলাসে ভাব-প্রবণ রমেন্দ্রনাথের কখনও অনুরাগ দেখা যায় নাই! তাহার উপর, আর একটি অমূল্য সামগ্রী বিধাতা তাহাকে দান করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন,—সেটি তাহার শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী, মায়া!

আজ পাচ বৎসর রমেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছে।

মায়াকে সে ঠিক আপনার মনের মতই গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রথম যেদিন মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় 'শ্রীমতী মায়া দেবী' স্বাক্ষরিত কবিতা প্রকাশিত হইল, সেদিন রমেন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে নিপীড়িত করিয়া কবির সুরে গাহিয়াছিল,"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো!"

পুরাতন ডেস্ক খুঁজিলে বিস্তর কাগজ-পত্র রমেন্দ্রনাথের কবি-যশোলাভের বিফল প্রয়াসের প্রচুর সাক্ষ্য প্রদান যে না করে, এমন নহে! এমন কি, বিবাহের অব্যবহিত পরেই, পত্র লিখিবার সময়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সে আপনার বিকচোন্মুখী কবি-প্রতিভার পরিচয়-প্রদানে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু যেদিন সে মায়ার বাক্সে, তাহার রচিত "পাখীর প্রতি," ও "আকাশের তারা" প্রভৃতি কবিতার দর্শন পাইল, সেইদিন হইতে, নিতান্ত বুদ্ধিমানের মত, কবিতার লেখক হইবার বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া সে ভক্ত পাঠকমাত্র হইয়া উঠিল! কবিতা-রচনার স্বত্বটুকু স্ত্রীর নামেই সে দানপত্র লিখিয়া দিল!

কিন্তু এত কথা বলিবার আমাদের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না। তবে এক পরিপূর্ণ বর্ষার দিনে রমেন্দ্রনাথের এই কাব্যরসজ্ঞতার মাত্রা অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই কথাই এখন আমরা বলিতে বসিয়াছি!

২

শ্রাবণ মাসের শেষ! সারাদিন মেঘ আর বৃষ্টি! মুহূর্ত্ত বিরাম নাই! রৌদ্র যেন চিরকালের জন্য দেশত্যাগ করিয়াছে! দর্দ্দুরের নিরবচ্ছিন্ন সঘন রব,—চারিধারে একটা নিরানন্দময় ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল!

দিবা দ্বিপ্রহর! আপনার কক্ষে খাটে শুইয়া রমেন্দ্রনাথ 'কাব্যগ্রন্থ' পাঠ করিতেছিল। মায়া নিকটে নাই! ভগ্নীর

বিবাহোপলক্ষে সে চাঁপাতলায় পিত্রালয়ে গিয়াছিল। ফিরিতে এখনও দুই-তিন দিন বিলম্ব হইবে।

কাব্য পড়িতে পড়িতে রমেন্দ্রনাথের চিত্ত উদাস হইয়া উঠিল! দক্ষিণের জানালা খোলা ছিল। তাহার মধ্য দিয়া সে মাঝে মাঝে আকাশের পানে চাহিতেছিল। ঘরের নীচে ছোট বাগান। বাগানের কোণে একটা কদম ফুলের গাছ, অজস্র ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারই মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। নোনাগাছে বসিয়া একটা কাক নিঝুমভাবে ভিজিতেছিল! পাতার ফাঁক দিয়া বৃষ্টির ফোঁটা তাহার কালো পালকের উপর পড়িতেছিল—কাকটা মাঝে-মাঝে চক্ষু মুদিতেছিল—আর কখনও-বা সিক্ত শাখায় চঞ্চু ঘসিতেছিল। চারিধারে কোন সাড়া-শব্দ নাই, শুধু বৃষ্টির একটা ঝমঝম শব্দ! নিরীহ কাকটাকে অবলম্বন করিয়াই রমেন্দ্রনাথের কল্পনা ধীরে ধীরে আসরে নামিল! সে ভাবিল, আহা, বেচারা পাখী! নিতান্ত নিঃসঙ্গ, আশ্রয়হীন! কোথায় তার গৃহ, কোথায় তার সঙ্গীর দল, কোথায় তার প্রিয়া, আর কোথায়ই বা সে। তাহারই মত নিঃসঙ্গ, অসহায় অবস্থা আজ রমেন্দ্রনাথের! বিশ্বের বিরহব্যথা আজ এমন বর্ষা পাইয়া তাহার হৃদয়টিকে ঐ সুদূর কালো মেঘের মতই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে! উঠিয়া জানালার ধারে আসিয়া রমেন্দ্রনাথ দাঁড়াইল। ভাবিল, একবার চাঁপাতলা ঘুরিয়া আসি! কিন্তু মায়া বারণ করিয়াছে। মায়া লিখিয়াছে,—চিঠিখানি তখনও 'কাব্যগ্রন্থের' মধ্যে রক্ষিত ছিল—রমেন্দ্রনাথ আবার চিঠি পড়িল,—অন্যান্য

কথার পর মায়া লিখিয়াছে,—"তুমি চিঠিতে যা-তা অমন করে লিখোনা। তোমার চিঠি এলে সকলে এখানে বড় টানাটানি করে, বিশেষ সেজদিদি। তার কাছে ছাড়ান্ পাবার জো নাই! আর তুমি এখানে বেড়াতে আসবে কি না আমার মত চেয়েছ, তাই লিখছি—তুমি এসো না, আর ত তিন দিন পরেই আমি যাব! এম্‌নি ত তুমি এদিকে বড় একটা আসনা, বিয়ের সময় যা দুদিন এসেছিলে, তার পর আবার-এখন যদি আস ত, সবাই ঠাট্টা করবে —বলবে, মায়া আছে বলেই এত ঘন-ঘন আসছে। লক্ষ্মীটি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এলে আমি ভারী লজ্জা পাব—" ইত্যাদি!

রমেন্দ্রনাথের বুকটার ভিতর কে যেন পাথরের ঘা মারিতেছিল। পকেটে চিঠি রাখিয়া সে বাহিরের দিকে চাহিল! নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, চিঠিতে দুইটা প্রাণের কথা বলিয়া তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করি, তাহাতেও তোমার লজ্জা! একবার গিয়া একটা চকিত চাহনিমাত্র আকাঙ্ক্ষা করি, তাহাতেও তোমার আপত্তি! কেন এমন কর, মায়া! উন্মত, উন্মুখ, পিয়াসী প্রাণীকে নিরাশার শাসনে এমন অযথা ব্যথিত কর! বেশী নয়, দীর্ঘ নয়, শুধু এতটুকু মৃদু স্পর্শ! ওগো প্রিয়া, ওগো চিরপ্রিয়া, তাহা হইতেও বঞ্চিত করিয়া তুমি কি সুখ পাও! একটা বীণা যেমন নিজে একখণ্ড কাষ্ঠ ও তারের সমষ্টিমাত্র, বাদকের কর-স্পর্শে কেমন বিচিত্র সঙ্গীতে সে মুখরিত হইয়া উঠে, রমেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিল সে-ও যেন ঠিক তেমনই! মায়ার বিরহে সে-ও তেমনই অচেতন জড়মাত্র!

এমন কাজল-ঘন মেঘ, এমন সীমাহীন স্বপ্নময়তা,—প্রাণটাকে যে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখা যায় না! রমেন্দ্রনাথ কাব্য রাখিয়া হার্ম্মোনিয়মের পাশে গিয়া বসিল—গান ধরিল,—

"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী,
সখি, জাগো জাগো"—

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "প্রিয়বাবু এসেছেন!"

রমেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল, "প্রিয়বাবু! এই বৃষ্টিতে!"

প্রিয় রমেন্দ্রনাথের বন্ধু। উভয়ে এক সঙ্গে কলেজে পড়িত। ল পাশ করিয়া আজ তিন বৎসর সে হাইকোর্টে মিথ্যা যাতায়াত করিতেছে!

রমেন্দ্র বাহিরে আসিয়া কহিল, "কি হে, ব্যাপার কি? এই বৃষ্টিতে এসে হাজির! কোর্টে যাওনি?"

প্রিয় কহিল, "ক্ষেপেছ! এই বর্ষায় কোর্ট! আর, তা ছাড়া একটু কাজ আছে!"

রমেন্দ্র কহিল, "কি কাজ?"

প্রিয় কহিল, "তোমাকে একবার আমার সঙ্গে বারাশত যেতে হবে!"

রমেন্দ্র কহিল, "অপরাধ?"

প্রিয় কহিল, "আরে—এক ফ্যাসাদে পড়েছি, ভাই! আমার ঐ পিসতুতো ভাইটার বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে যেতে হবে! তাঁরা আবার চলে যাবেন, পিসিমারও বড্ড জেদ—তাই একলা

কোথায় এই বৃষ্টিতে যাব! তোমাকে পাকড়াতে এসেছি, নাও, নাও, আর দেরি নয়—ধড়াচুড়ো পরে নাও”—

রমেন্দ্র কহিল, “আহা, দাঁড়াও! এই বৃষ্টি!”

“আর দাঁড়াবার সময় নাই” বলিয়া প্রিয় তাড়াতাড়ি ঘড়ি খুলিল, “এই ত একটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে! ছুটোয় ট্রেণ! রথ প্রস্তুত। তুমি শুধু কাপড়টা ছেড়ে চট্ করে এস। তোমায় প্রথম রাত্রেই পৌঁছে দিয়ে যাব! আর হার ম্যাজেষ্টিও ত এখানে নেই হে! আহা, এমন বর্ষাটী, দাদা, মাঠে মারা গেল! যাও, যাও,—ওরে ভুলো বাবুর জামা কাপড় ঠিক করে দে, শীগগির!”

রমেন্দ্রনাথ ট্রেণে চড়িয়া হাঁফ ছাড়িল। এই যে লাইনের দুই ধারে মাঠের পর মাঠ, দূরে কোথাও গ্রামের সীমা নিমেষের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছে,—এই অনাড়ম্বর উদার সৌন্দর্য্য, বর্ষায় সবুজ প্রাচুর্য্যের ঘন শোভা—এই চিরপরিচিত পল্লীশ্রী,—নয়নে কখনও ইহা পুরাতন হইবার নহে!

বিজন মাঠের প্রান্তে কুটির দেখিয়া রমেন্দ্র কহিল, “বাঃ, কি সুন্দর।”

প্রিয় কহিল, “ঐ ট্রেণ থেকেই দেখতে বেশ। ওখানে বাস করতে হলে, ব্যাপার ভীষণ হয়ে উঠবে। না আছে, কাছে বাজার, না ডাক্তার—”

রমেন্দ্র কহিল, “তোমরা অতি হতভাগ্য! এমন সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পার না! কেবল ডাক্তার আর বাজারের ভাবনাতেই আকুল হয়ে ওঠ! কবি কি বলেছেন, জান,

"নিরালা বনের মাঝে, তৃণগুল্ম যেথা রাজে,
রচিব কুটির, প্রিয়ে, তোমারি লাগিয়া,
একান্তে দুজনে রব, যত কথা সব কব,
বিশ্বেরে রাখিব দূরে, দুয়ার রুধিয়া।"

প্রিয় কহিল, "তাহলে প্রিয়াকে নিয়ে একবার কবিত্ব-বিকাশের অবসরটুকু আয়ত্ত কর, কবিবর!"

প্রিয় ঠাট্টা করিয়া কথাটা বলিল বটে, কিন্তু রমেন্দ্রর মাথায় বেশ একটি সুন্দর মতলব জাগিয়া উঠিল।

৩

মায়া ঘরে বসিয়া কবিতা নকল করিতেছিল। রমেন্দ্র আসিয়া কহিল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, মায়া।"

মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া মায়া কহিল, "কি?"

রমেন্দ্র ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কহিল, "কলকাতার এ একঘেয়ে জীবন অসহ্য হয়ে পড়েছে! তাই—"

মায়া হাসিয়া নিকটে আসিল, কহিল, "তাই, কি করতে হবে, শুনি!"

রমেন্দ্র কহিল, "একটু পল্লীবাসের আয়োজন স্থির করেছি—!"

মায়া বিস্মিতভাবে কহিল, "সে আবার কিগো?"

রমেন্দ্র কহিল, "বজ্‌বজ্‌ যাবার পথে সন্তোষপুর ষ্টেশন।

সেখানে আমার এক বন্ধুর বাগানবাড়ী আছে,—যখন কলেজে পড়তুম, তখন দু-একবার গিয়েছি,—সেখানে চল, দু-চার দিন বাস করে আসা যাক! শুধু তুমি আর আমি, সঙ্গে আর কেউ নয়!"

মায়া কহিল, "খাওয়া-দাওয়ার উপায়? কাব্যে ত আর পেট ভরবে না!"

রমেন্দ্র কহিল, "ঐ জন্যই ত তোমাদের কোন উন্নতি হয় না! যেখানে যাবে, অমনই সাত-শ অক্ষৌহিণী সঙ্গে নিতে হবে! কেন, নিজেরা দুদিন আর খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারব না?"

মায়া কহিল, "তার পর বিদেশ-বিভুঁই, পাড়া গাঁ হোক, যাই হোক্, ফাই-ফরমাসটার জন্যও ত একটা লোক নিয়ে যেতে হবে!"

রমেন্দ্র কহিল, "কোন দরকার নাই—তাদের মালী সেখানে আছে—সব সে ঠিক করে দেবে!"

মায়া কহিল, "বাঃ! তুমি সব ঠিক করে ফেলেছ—আমার জন্য আর কিছু বাকী রাখনি!"

রমেন্দ্র কহিল, "যথেষ্টই রেখেছি। এখন, একটা ফর্দ্দ করে ফেল দেখি, এক সপ্তাহ অন্ততঃ থাকব—তার মত ফর্দ্দ করলেই হবে!"

মতলবখানা মায়ারও মন্দ লাগিল না! তাহা হইলে, কিন্তু বেশ হয়! সেই ছেলেবেলা, কবে মায়া একবার পল্লীগ্রামে তাহার পিসিমার বাড়ী গিয়াছিল,—কত বাগান, পুষ্করিণী, খোলা

জায়গা, পল্লীরমণীগণের কি সে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি! চারিধারে হাসি-আনন্দ যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে! পরস্পরের মধ্যে কি সে এক গভীর প্রীতির বন্ধন,—কলিকাতায় যাহা একান্ত বিরল! পাখীর বিচিত্র কলরবে নিত্য-মুখরিত ছায়া-নিবিড় ঘাটে রমণীগণের স্বচ্ছন্দ নিরাপদ মজলিস, সে যেন আর এক রাজ্য, সম্পূর্ণ এক নূতন জিনিস! অবরোধের লৌহকপাট কোন জায়গায় চাপিয়া ধরে নাই; দিব্য মুক্ত স্বাধীনতার বিশাল উদার সুখ! সে কি সুন্দর!

স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া তখনই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের তালিকা করিয়া ফেলিল। বিছানা, ষ্টোভ, হরিকেন লণ্ঠন, বাতি, কুইনিন, চায়ের সরঞ্জাম, কণ্ডেন্সড্ মিল্ক, সোডা, লেমনেড, সাবান, অল্প পরিমাণে মসলা, চাল, ডাল, ঘৃত, লবণ, জলের কুঁজা, গেলাস প্রভৃতি অর্থাৎ যাহা না লইলে নয়, এমন জিনিসমাত্র। থালা প্রভৃতি বহিবার কোন প্রয়োজন নাই, সেখানে কদলীপত্র নিশ্চয়ই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়!

প্রিয় শুনিয়া বারণ করিল, "এ সময়টা ম্যালেরিয়া ধরে হে, ও বাই ছাড়।" কিন্তু রমেন্দ্র হটিবার পাত্র নহে! বুধবার যাইবার দিনস্থির হইল।

৪

বিছানাপত্র বাঁধিয়া ভৃত্য ষ্টেশনে চলিয়া গেল। সেগুলি পূর্ব্বাহ্নেই পাঠাইয়া দেওয়া হইবে! রমেন্দ্র ও মায়া ৩-৪০ মিনিটের গাড়ীতে রওনা হইবে!

রমেন্দ্র ও মায়া যখন বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বজবজের ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। রেলওয়ে ও কলিকাতার সময় লইয়া রমেন্দ্র গোল বাধাইয়া বসিয়াছিল। পরবর্ত্তী ট্রেণ ছাড়িবে, ৫-৫৪ মিনিটে। চারিধারে তখন মেঘ জমিতেছিল। এতক্ষণ ধরিয়া ষ্টেশনে বসিয়া থাকাও ত সহজ ব্যাপার নহে!

মায়া বলিল, "প্রথমেই যখন বাধা পড়ল, তখন বাড়ী ফিরে চল, বাবু, আজ কাজ নেই, সন্তোষপুর গিয়ে।"

রমেন্দ্র কহিল, "বাড়ী থেকে যখন বেরিয়েছি, তখন যাবই!"

পাঁচটা চুয়ান্নর গাড়ীও বেলিয়াঘাটা ছাড়িল, আর মাথার উপর আকাশও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল! কি ভয়ঙ্কর বৃষ্টি! মেঘে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সেকেণ্ড ক্লাশের এক কক্ষেই রমেন্দ্র ও মায়া উভয়ে বসিয়াছিল। বাহিরে চারিদিক দেখিতে মন্দ নয়! দুইধারে বড় বড় হোগলা-বন! মায়া এই প্রথম হোগলা দেখিল! এই হোগলা! কাজকর্ম্মের সময়, ইহা দ্বারাই ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হয়! বাঃ, বেশ ত!

কালিঘাট ও মাঝেরহাট ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকু মায়ার বেশ লাগিল। রেলওয়ে লাইনের পাশ দিয়া খাল বহিয়া গিয়াছে, খালের উভয় পার্শ্বে স্তূপাকার মাটি কাটিয়া জমা করিয়াছে! মায়া এ দৃশ্যবৈচিত্র্যে বৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

গাড়ী যখন মাঝেরহাট ষ্টেশন ছাড়িল, তখন বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল। গাড়ীর ছাদ ভেদ করিয়া বৃষ্টির ফোঁটা পড়িতে

লাগিল। ষ্টোভ, লণ্ঠন, কোন্‌টাই বা সামলাইয়া রাখিবে? একদিককার সার্শি এমন আঁট হইয়াছিল যে, তাহা বৃথা টানাটানি করিতে গিয়া রমেন্দ্র ভিজিয়া সারা হইল।

মায়া কহিল, "আমি তখনই বলেছিলুম—এই বর্ষায় বেরিয়ো না!"

রমেন্দ্র কহিল, "কেন, এ মন্দ কি? একঘেয়ে জীবনের চেয়ে ভাল নয় কি?"

কথাটা মুখে সে বলিল বটে, কিন্তু তাহার মনে ভয় হইতেছিল! এই বর্ষার রাত্রি—অপরিচিত স্থানে কি করিয়া কাটিবে! কিন্তু ফিরিবার মুখ, সে রাখে নাই! বেলিয়াঘাটা হইতে মায়ার কথায় যদি সে ফিরিত! কুগ্রহ আর কাহাকে বলে!

ট্রেণ যখন সন্তোষপুরে থামিল, তখনও বৃষ্টির বিরাম নাই! রমেন্দ্র ভাবিতেছিল, বরাবর বজবজ গিয়া এই ট্রেণেই আবার সে ফিরিবে! কিন্তু সন্তোষপুর পৌঁছিবামাত্র দ্বিতীয় চিন্তা না করিয়া সে মায়ার হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িল। অতিকষ্টে মোটপত্র নামাইয়া টিনের সেডের তলায় বেঞ্চে আসিয়া বসিল। ট্রেণও ছাড়িয়া দিল!

চারিধার হইতে তখন ভেকের দল রাগিণী তুলিয়াছিল! জীর্ণ টিনের সেড বর্ষার আক্রমণ হইতে যেন আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারে না! একটা প্রকাণ্ড বাঁশের ছাতা মাথায় দিয়া, ষ্টেশনমাষ্টার অদূরস্থ বাসায় চলিয়াছিলেন, সহসা

এই অভাবনীয় অতিথিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন! এমন স্থানে এমনটি দেখিবার আশা করাই যে বাতুলতা! ষ্টেশনে একটা জমাদার ছিল—আর জনপ্রাণী না! ষ্টেশনের নিম্নে জমিগুলা জলে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে সরু পথ কোন মতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আকাশের গতিক একটুও আশা-প্রদ নহে! বরং, রীতিমত আশঙ্কাজনক!

ষ্টেশনমাষ্টার কহিল, "মশায়, এখানে—আপনি—?"

রমেন্দ্র কহিল, বিশেষ প্রয়োজনে এখানে সস্ত্রীক সে আসিয়া পড়িয়াছে। পথিমধ্যে এই দুর্য্যোগ! সন্তোষপুর গোয়ালা-পাড়ায় কলিকাতার ব্রজ চৌধুরীর বাগানবাড়ী—সেখানে সে যাইবে! জমাদার সে বাগান চিনিত। কহিল, "সে যে পোড়ো বাড়ী, বাবু!"

মায়া ভড়কাইয়া গিয়াছিল! ষ্টেশনে ওয়েটিং রুম নাই, এবং গাড়ী নাই, এমন দেশ, ইংরাজের আমলে কলিকাতার কাছে যে থাকিতে পারে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই! এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে? তবু স্ত্রীলোকের সকল বল-ভরসা যে স্বামী, তিনি নিকটে, এইটুকুই তাহার একমাত্র সান্ত্বনা! নহিলে সে এতক্ষণে কাঁদিয়া-কাটিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিত। রমেন্দ্র সন্ধান লইয়া জানিল, তাহার নামে বিছানার লগেজ বা কোন লগেজ এখানে আসে নাই! শুনিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ইহার অর্থ কি?

ভিজা জিনিসপত্র—কতক ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রাখিয়া,

কতক জমাদারের মাথায় চাপাইয়া, স্বামী স্ত্রী জলপথেই যাত্রা করিল। ষ্টেশনমাষ্টার মহাশয় একখানি পর্ণ-কুটিরে কোনমতে মস্তক রক্ষা করিতেন, কাজেই সেখানে আতিথ্য-গ্রহণ একেবারে সম্ভাবনার বাহিরে!

মায়া বলিল, "বাড়ী ফিরে চল!"

রমেন্দ্র কহিল, "আবার ও কথা? ছিঃ—এরা পাগল মনে করবে যে!" রমেন্দ্ররও ফিরিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু সে চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিতে পারিল না!

৫

পথে রমেন্দ্রর পাম্পস্ ভিজিয়া আপনার জুতা-জন্ম বিসর্জ্জন দিবার উপক্রম করিল!

জলে হাঁটিয়া বাসায় পৌঁছাইয়া রমেন্দ্র জমাদারকে বখশিস্ দিয়া বিদায় করিল।

হরিকেন লণ্ঠনটিকে কোনমতে জ্বালাইয়া রমেন্দ্র দেখিল, গৃহটি চামচিকার আবাসস্থল! আরশুলা-মাকড়সা প্রভৃতিরও অন্ত নাই! ছাদ দিয়া ঘরের মধ্যে বেশ জল পড়ে! একখানি ভগ্ন পালঙ্কমাত্র অতীত গৌরবের শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার একখানি পদ আবার অদৃশ্য! পাঁচ-ছয়খানি ইষ্টকখণ্ডে পালঙ্ক আপন পদমর্য্যাদা কোনমতে রক্ষা করিয়াছে!

কাব্যরসজ্ঞ হইলেও রমেন্দ্রনাথ ক্ষুধার সময় আহার না পাইলে অস্থির হইয়া পড়ে! এইটুকুই তাহার বিশেষত্ব! কিন্তু তাহারও

যেমন দুর্ভাগ্য! একটা হাঁড়ির মধ্যে কয়েকখানা লুচি ও কিছু তরকারী কলিকাতা হইতে অন্য রাত্রির জন্য আনা হইয়াছিল, সেটির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না—হয়, বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে, নয় ট্রেণে নিশ্চয় সেটি ফেলিয়া আসা হইয়াছে!

মায়া বলিল, "তুমি বলেছিলে, মালী আছে—কই সে?"

রমেন্দ্র কহিল, "তাইত, বেটা হয়ত কোথা ভেগেছে!"

মায়া কহিল, "মাগো, এখানেও জনমানব থাকে! যেন বনবাসে এসেছি।"

রমেন্দ্র মায়ার অধরে চুম্বন করিয়া কহিল, "বেশ ত মায়া, এটা আমাদের পঞ্চবটী।"

অনাহারে রাত্রি কাটাইবার সঙ্কল্প করিয়া পালঙ্কে স্বামী স্ত্রী কোনমতে নিদ্রার আয়োজন করিয়া লইল! নিদ্রাই কি হয়! সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু গর্জ্জিতেছে! বৃষ্টির অবিশ্রাম ধারা! মেঘের বিকট গর্জ্জন! আর ভিতরে মশারও তেমনই দৌরাত্ম্য! আর এ কি মশা! যেন এক-একটা পাখী! মায়ার মনে হইতেছিল, বুঝি মহাপ্রলয়ের দিন আসিয়াছে! রমেন্দ্র ভাবিতেছিল; হায়, হায়, সাধ করিয়া কেন এ বিপদ ডাকিয়া আনিলাম!

একবার মায়ার মনে হইল, বাহিরে কে যেন কাঁদিতেছে,—ঐ না দ্বারে কে ঠেলা দেয়! সে প্রাণপণ বলে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল। একান্ত নিরুপায় রমেন্দ্রনাথ চারিটী বাতি জ্বালাইয়া স্ত্রীর ভরসার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইল।

৬

ভোর হইল! তবু বৃষ্টির বিরাম নাই! তাহার উপর আবার ঝড় আরম্ভ হইয়াছে! রমেন্দ্র কহিল, "তুমি দোর দিয়ে বসে থাক, আমি একটু আহারের জোগাড় দেখি!"

মায়া কহিল, "না—চল, বাড়ী ফিরে যাই!"

রমেন্দ্র কহিল, "আমারই কি অসাধ, মায়া? তবে এই ঝড়-বৃষ্টি, —কোথায় ষ্টেশন—পথ চিনি না—তোমাকে নিয়ে শেষে বিপদে পড়ব! একটা মানুষকেও ত খুঁজে বার করা দরকার! এ যে অন্ধকূপ-হত্যার জোগাড়!"

মায়া কহিল, "তাইত, এখন উপায়? তোমাকে তখনই বলেছিলুম!" মায়া করুণভাবে রমেন্দ্রর পানে চাহিল।

রমেন্দ্র কহিল, "বাহিরে একটু দেখি—লোকালয়ের কোন চিহ্ন আছে কি না।" উভয়ে বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। দূর হইতে দুই-একটা ছেলের অস্পষ্ট চীৎকার শুনা যাইতেছিল! আর সেই দূরে কদলী কুঞ্জের আড়ালে একটা চালাঘরও না ঐ দেখা যায়!

রমেন্দ্র কহিল, "তুমি একটু সাহস করে এইখানে বস, মায়া। আমি আহারের সন্ধানে যাই, নহিলে কি এই বনের মধ্যে মরে থাকব, দুজনে!"

মায়া কহিল, "কিন্তু শীঘ্র এস—নহিলে আমি ভয়েই হয়ত মরে থাকব।"

ভিজিতে-ভিজিতে রমেন্দ্র চলিয়া গেল! কিছু দূরে পথটা ঘুরিয়া

গিয়াছে। সেই মোড়ের উপর রাঙচিত্রের বেড়া-ঘেরা পাতার কুটির,—সেখানে একঘর গোয়ালার বাস! রমেন্দ্রর ডাকাডাকিতে এক গোপরমণী আসিয়া দ্বারান্তরালে অবগুণ্ঠন টানিয়া দাঁড়াইল।

রমেন্দ্র কহিল, "বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আছে কি, কেউ?"

সে রমণী—পরপুরুষের সহিত কথা কহে কি বলিয়া?—দ্বার হইতে নড়িতেও চাহে না, অথচ, মাথা নাড়িয়া উত্তরটা দেওয়াও প্রয়োজন মনে করে না! রমেন্দ্র ভাবিল, কি অদ্ভুত জীব!

বিরক্ত হইয়া রমেন্দ্র ফিরিল! ফিরিয়া দেখে, অদূরে একটা লোক টোকা মাথায় দিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। সে আসিয়া কহিল, "বাবু, আপনার বিছানার মোট আজ ভোরে এসে পৌঁচেছে। গোলমালে একেবারে বজবজ চলে গিয়েছিল—সেখানে সারারাত্রি বৃষ্টিতে ভিজেছে। সকালে হঠাৎ গার্ডসাহেবের চোখে পড়ায় ভোরের ট্রেণে সন্তোষপুর এসেছে। ষ্টেশনমাষ্টার মশায় খবর দিয়ে পাঠালেন!" লোকটা কল্যকার ষ্টেশনের জমাদার!

ইতিমধ্যে গোয়ালা আসিয়া পড়িল। ব্রজ বাবুর বাড়ীতে অতিথি!—শুনিবামাত্র গোয়ালা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাবুদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। পরে বলিল, "বাবু, রাত্রে ও বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব হয় শুনেছি—তবে দেখিনি। মালীর কাছেই শুনেছি। সে দু-তিনদিন ভয় পেয়ে জ্বরে পড়ে—সেজন্য আজ সাত-আট দিন হল, সে পালিয়েছে!"

রমেন্দ্র ভাবিল, কথাটা ভাগ্যে কাল তাহারা শুনে নাই!

গোয়ালা ও জমাদারের সাহায্যে বাজারের ব্যবস্থা হইল।

দুধ, মৌরলামাছ, পুঁইশাক ও দুই-চারিটি মাত্র কাঁচকলা! আর কিছু পাওয়া গেল না।

রমেন্দ্র কহিল, "খিচুড়ী চড়ানো যাক! বেশী লেঠায় কাজ নাই!"

উভয়ে ভীষণ উদ্যমে লাগিয়া যে আহার্য্য প্রস্তুত করিল, তাহা মনুষ্যের মুখে রুচিবার মত ত নহেই! ডাল ও চালে মিলিয়া যে এমন বীভৎস দ্রব্যের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই! কিন্তু ক্ষুধাতিশয্যে তাহাও এতটুকু পড়িয়া রহিল না।

রমেন্দ্র কহিল, "খাসা হয়েছে, মায়া!

মায়া লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার মনে ধিক্কার জন্মিয়াছিল। কবিতা লিখিয়া কত সম্পাদকের নিকট হইতে সে বাহবা লইয়াছে, কিন্তু নারীর কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সে এমন অপদার্থ। স্বামীকে একদিন রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যে তৃপ্তিদান করিবে, সে সামর্থ্যটুকু তাহার নাই। ছিঃ।

বিকালের দিকে ঝড় ও বৃষ্টি থামিল! এবং কম্প দিয়া মায়ার জ্বর আসিল! রমেন্দ্র পাগলের মত হইয়া উঠিল! এখন, উপায় কি? এমনও দেশ—না আছে গাড়ী, না পাল্কী!

গোয়ালার সাহায্যে একখানা ডুলি সংগ্রহ করিয়া, স্ত্রীকে লইয়া রমেন্দ্র ষ্টেশনে আসিয়া পড়িল! এবং সাড়ে সাতটার ট্রেণে উঠিয়া একেবারে কলিকাতা। জিনিষপত্র পাঠাইবার ভার ষ্টেশন্-মাষ্টারবাবুটি গ্রহণ করিয়া রমেন্দ্রকে যথেষ্ট অনুগৃহীত করিলেন!

কলিকাতায় আসিয়াই রমেন্দ্রর আমাশয় হইল! সেদিনকার

লুচির হাঁড়ির সন্ধান মিলিয়াছিল; সেটা বাড়ীতেই পড়িয়াছিল, ষ্টেশনে হারায় নাই।

দশ-বারো দিন রোগ ভোগ করিয়া উভয়েই আরোগ্য-লাভ করিল। আরোগ্যলাভ করিয়াই মায়া পঞ্জিকা আনিয়া রমেন্দ্রকে দেখাইল,—যেদিন তাহারা স্বামীস্ত্রীতে সন্তোষপুর গিয়াছিল, সেদিন যাত্রার পক্ষে মহা অশুভ দিন! কারণ, সেদিন ত্র্যহস্পর্শ যোগ ছিল! পঞ্জিকা না দেখিয়া যাওয়াতেই যে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, ইহা প্রমাণ করিয়া রমেন্দ্রের লজ্জা ও সঙ্কোচটুকু সে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা, তাহার সঠিক সংবাদ আমরা বলিতে পারি না। তবে, আরোগ্যলাভের পর, কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। যথা, পল্লীগ্রামের নামে সেই অবধি রমেন্দ্রনাথের প্রাণ শিহরিয়া উঠে। মাসিক পত্রিকার সম্পাদকবর্গ নানা অনুরোধ-উপরোধেও আর মায়া দেবীর কবিতা পান না, এবং রমেন্দ্রনাথের বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই রমেন্দ্র-ভবনে নিমন্ত্রণে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া থাকেন,—নানাবিধ নিরামিষ তরকারী, দই-মাছ, কাটলেট, চপ, পোলাও,—কোনটিই রসনার পক্ষে অল্প লোভনীয় নহে! এবং ইহাও আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি যে, সকল খাদ্যই স্বহস্তে প্রস্তুত করেন, বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাদির ভূতপূর্ব্ব কবি, শ্রীমতী মায়া দেবী!